KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : 28 চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-২৬
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত
Title : সমকালীন (SAMAKALIN)	Size : 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৮/- ৮/- ৮/- ৮/-	Year of Publication : জুন, ১৯৬৪ আশ্বিন, ১৯৬৪ কার্তিক, ১৯৬৪ অগ্রহায়ণ, ১৯৬৪
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : আনন্দ গোপাল সেনগুপ্ত	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

Regd. No. C3597 Phone: 23-5155 September '58 (0.50) SAMAKALIN

কমনীয় কেশরাশির গোপন কথা

টাটার
সুবাসিত কোকোনাট হেয়ার অয়েল
ও শ্যাম্পু

সমকালীন

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

৬ষ্ঠ বর্ষ
আশ্বিন ॥ ১৩৬৫

= সম্পাদক =

= আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত =

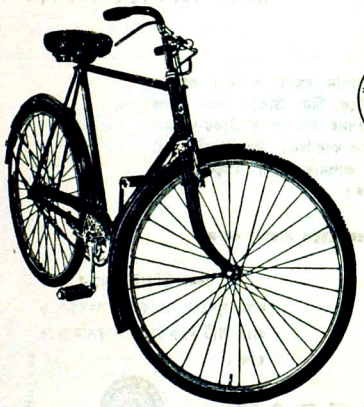

So many brands to choose from!

Each one spells quality

You can be sure of supreme quality when you choose from the Hind range of brands! Every Hind cycle is built to last. Indeed, over a million riders already associate these handsome cycles with smooth enduring service. And every machine to come out of the Hind Cycle Factory is designed to provide a life-time of trouble-free, effortless cycling.

JAWAHAR

STAG

ROYAL STAR

HIND CYCLES LIMITED BOMBAY

SPEED KING

ADMIRAL

HIND

HIND CYCLES LTD., 250 WORLI, BOMBAY 18.

ASP/HC 113

সমকালীন

ষষ্ঠ বর্ষ ॥ আশ্বিন ॥ ১৩৬৫

। সূচীপত্র ।

প্রবন্ধ ॥ বাঙালীর বাণিজ্যবৃত্তি। বিনয় ঘোষ ৩৪৫

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীর মূর্তি-কল্পনা। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ৩৫১

ভারতীয়-দর্শনে যুক্তিবিচারের স্থান। রমা চৌধুরী ৩৫৯

ইবসেন। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৬৩

কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ। রতন সান্যাল ৩৭২

বিংশ শতাব্দীর চেতনায় গণতন্ত্র। অচিন্ত্যেশ ঘোষ ৩৮১

ডেরোজীয়, রামমোহন ও বিপ্লব। যোগানন্দ দাস ৩৮৭

কবিতা ॥ অনুবাদ। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৩৭৮

অনুস্মৃতি ॥ সান্নিধ্য। চিন্তামণি কর ৩৯৭

সংস্কৃতি প্রসঙ্গ ॥ সঙ্গীতের বিবর্তন ও বাদ্যযন্ত্র। গোপীনাথ গোস্বামী ৪০১

আলোচনা ॥ বাংলা শিক্ষা সমস্যা। অশোক ঘোষ ৪০৫

বাংলা কাব্যসাহিত্যে নাগরিকতা। দুর্গাদাস সরকার ৪০৮

সমাজসমস্যা ॥ বুদ্ধিজীবি ও রাষ্ট্রমনস্কতা। সুব্রতেশ ঘোষ ৪১০

সমালোচনা ॥ কবিগান ও কবিওয়ালা। গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত ৪১৩

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। হরেন ঘোষ ৪১৫

সম্পাদক

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্তৃক মডার্ন ইণ্ডিয়া প্রেস ৭ ওয়েলিংটন স্কোয়ার হইতে মুদ্রিত ও ২৪ চৌরঙ্গী রোড্ কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত।

...ওঁকে অবজ্ঞা করবেন না

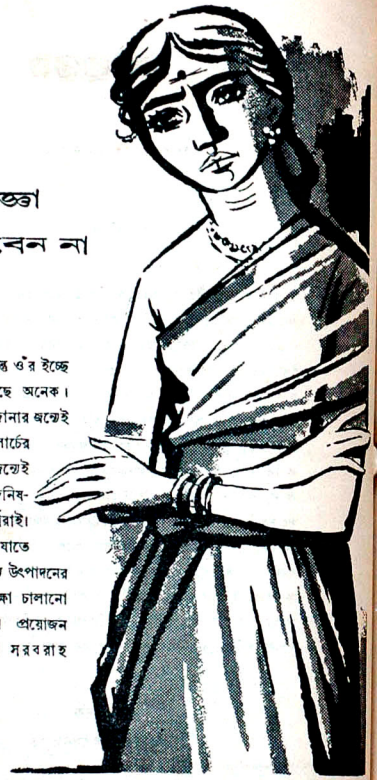

সাধারণ একজন গৃহকর্ত্রী... কিন্তু ওঁর ইচ্ছে অনিচ্ছের মূল্য আমাদের কাছে অনেক। ওঁর কি প্রয়োজন শুধু এইটুকু জানার জন্যেই আমরা সারা দেশে মার্কেট রিসার্চের কাজ পরিচালনা করি। সেইজন্যেই হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী জিনিষ-পত্রের মান নির্নয় করছেন গৃহকর্ত্রীরাই। এই জিনিষগুলির গুণাগুণের যাতে কোন তারতম্য না ঘটে সেইজন্যে উৎপাদনের বিভিন্ন স্তরে নানাধরনের পরীক্ষা চালানো হয়। তাই আমরা আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী ভাল জিনিষপত্র সরবরাহ করতে সক্ষম।

দশের সেবায় হিন্দুস্থান লিভার

HLL. 15-X52 BG

বাঙালীর বাণিজ্যবৃত্তি

বিনয় ঘোষ

আজকের বাণিজ্য আর সেই প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাণিজ্য নেই, যখন বণিকেরা দেশেবিদেশে জিনিসপত্তর বেচাকেনা করে, বস্তাভর্তি মোহর নিয়ে এসে ঘরে তুলতেন, ব্যবসা চালাতে বা হিসেব মেলাতে যখন হাজার হাজার কর্মীর প্রয়োজন হত না। এমন কি, ধনতান্ত্রিক যুগের আদিপর্বের 'বাণিজ্যও' আজ নেই, যখন পুঁজিপতিরা ছিলেন কর্মোদ্‌যোগী entrepreneur, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী—এবং যখন পণ্য ও বাজার দুয়েরই সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল অনেকটা প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত। কিন্তু আজকের প্রতিযোগী সমাজে বাণিজ্য বলতে যা বোঝায়, তা এত ব্যাপক ও জটিল ব্যাপার, এবং তার কলাকৌশল দুরস্ত করা এত দুরূহ যে তার জন্য স্বতন্ত্র সব শাস্ত্রগত বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়। এমন কি বেচা-বিদ্যা বা Salesmanship এবং বিজ্ঞাপনবিদ্যা পর্যন্ত। একদিকে যেমন মজুর, টেকনিসিয়ান ও ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা-বৈচিত্র্য বেড়েছে, তেমনি অন্যদিকে বেড়েছে বাণিজ্য-পরিচালকদের সংখ্যা ও বৈচিত্র্য। এতদিন আমরা জানতাম, পুঁজিপতির পরে—পণ্য যাঁরা হাতে-নাতে উৎপাদন করেন, সেই মজুররাই বুদ্ধি প্রধান। কিন্তু আজ উপরের পুঁজিপতি ও তলার মজুর, উভয়েরই আপেক্ষিক প্রাধান্য কমেছে। মধ্যিখানে ক্রমবর্ধমান এক মধ্যবিত্তশ্রেণীর বিকাশ হয়েছে ও হচ্ছে, যাঁরা কারখানা আর বাজারের মাঝখানে বিরাট বিরাট আপিসের অট্টালিকায় বসে, উৎপন্ন পণ্যের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করেন—ম্যানেজার, ডেপুটি ম্যানেজার, অডিটার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, স্টেনো, সেলসম্যান, ক্লার্ক প্রভৃতি—তাঁরাও আজ কম প্রধান নন। সমাজের এই বিবর্তনকে কেউ কেউ managerial revolution বলেছেন এবং এই বিপুলায়তন মধ্যশ্রেণীকে বলেছেন White Collar বা "বাবু-মজুর"। উনিশ-শতকী ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব দুয়েরই বিকাশ আজ এই সামাজিক ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এযুগের এই মধ্যশ্রেণী নিয়ে ব্যাপক অনুসন্ধান ও গবেষণা করেছেন, এরকম একজন বিখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী Wright Mills (C) তাঁর White Collar বইতে বলেছেন :

"The nineteenth century farmer and businessman were generally thought to be stalward individuals—their own men, men who could quickly grow

to be almost as big as anyone else. The twentieth-century white-collar man has never been independent . . . He is always somebody's man, the Corporation's, the governments', the army's, and he is seen as the man who does not rise. The decline of the free entrepreneur and the rise of the dependent employee . . . has parallelled the decline of the independent individual and the rise of the little man." 'Little Man' কথার মধ্যে যদিও mediocrity বা মাঝরিয়ের ভাব নিহিত আছে, তাহলেও 'Little Man' কথার বদলে 'mediocre man' বললে বোধ হয় আরও যুক্তিযুক্ত হয়। বড়দের যুগ এবং তার সঙ্গে ছোটদের যুগ, দুইই আজ নিশ্চিত অস্তাচলে। বর্তমান যুগ সর্বদিক দিয়েই মাঝারিদের যুগ। সমাজের সর্বক্ষেত্রে মাঝারিদের প্রভাবই দোর্দণ্ড। আমাদের দেশে ভারতবর্ষে, বিশেষ করে বাংলাদেশে, তার যাবতীয় লক্ষণ আজ সর্বক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকট। White-Collar বলতে যা বোঝায়, সারা ভারতবর্ষের মধ্যে বোধ হয় বাংলাদেশেই তার সংখ্যা বেশী। কেন বেশী, সেই কথাই বলব।

তা বলতে হলে প্রথমে বাংলাদেশের বাণিজ্যের কথা, তারপরে বিদ্যার কথা বলব। অনেকেই জানেন যে সমুদ্রকূলের নদনদীবহুল দেশ বলে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে বাণিজ্যের বিস্তার ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল যথেষ্ট। তাম্রলিপ্ত বা তমলুক বন্দর এবং 'city of Gange' বা গঙ্গা-নগর সেই সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক সাক্ষীরূপে উল্লিখিত হয়েছে। বর্তমান গঙ্গাসাগরের কাছে কোথাও প্রাচীন গঙ্গা-নগরের বিকাশ হয়েছিল বলে ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। পরিষ্কার বোঝা যায়, গঙ্গানদী ও বঙ্গোপসাগরের সঙ্গমস্থলের কাছে কোথাও ছিল বড় বন্দর এবং গঙ্গা-নগরের পত্তন হয়েছিল Port-town বা বন্দরনগর-রূপে। প্রাচীন যুগের কথা ছেড়ে দিয়ে মধ্যযুগে এলেও, বাণিজ্য ও বণিকশ্রেণীর বিকাশের বিস্ময়কর প্রমাণ পাওয়া যায় বাংলা-দেশে। বর্ধমান জেলায় গল্‌সী থানার মধ্যে মল্লসারুল নামে একটি গ্রাম আছে। এই গ্রামে ষষ্ঠ খৃষ্টাব্দের, অর্থাৎ প্রাচীন গুপ্তযুগের, একটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। তাতে এই অঞ্চলে তখন যাঁরা গণ্যমান্য ব্যক্তি ছিলেন তাঁদের নাম পাওয়া যায়। যেমন 'বব্রুতক' বা বাক্‌তার হিম দত্ত, বটবল্লকের ষষ্ঠী দত্ত, শ্রীদত্ত, গোধগ্রামের মহি দত্ত ও রাজদত্ত। এই হিম দত্ত, ষষ্ঠী-দত্ত, শ্রীদত্ত, রাজদত্ত, এঁরা কারা? পশ্চিমবঙ্গের গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক প্রভৃতি বণিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে দত্তরা অন্যতম। এঁরা মনে হয় এই বণিক দত্তদেরই পূর্বপুরুষ। প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এঁরা এক-একটি অঞ্চলের বিশেষ অগ্রগণ্য ব্যক্তি ছিলেন, প্রধানতঃ তাঁদের বাণিজ্যিক প্রতিপত্তির জন্যে। বাংলাদেশের এই সব বণিকসম্প্রদায়, বংশপরম্পরায় বাণিজ্য করে, প্রচুর বিত্ত ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন। হাজার-বার-শ' বছর পরেও এঁদের প্রতিপত্তির পরিচয় পাওয়া যায় মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে, বিশেষ করে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যে।

ধনপতি সদাগর আমি বসি হে উজানী
গন্ধবণিক জাতি বিদিত অবনী

বিখ্যাত ধনপতি সদাগর এই বলে খুল্লনার কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছিলেন। "বিদিত অবনী" বলতে 'international trade' বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আভাস পাওয়া যায়, এবং তাতে আশ্চর্য হবার, বা নিছক কবিকল্পনা বলে তাকে উড়িয়ে দেবার কিছু নেই। বাঙালী বণিকেরা তখনও নানা-গড়নের বাণিজ্যতরী নিয়ে দূর বিদেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। উজানি-নগরে ছিল ধনপতির বাস। অজয় নদের তীরে, বর্ধমানের উজানি-কোগ্রাম এই উজানি-নগর। কেবল

নামের সাদৃশ্য থেকে এই ঐতিহাসিক প্রমাণের কথা বলছি না। সাহিত্যের সমস্ত বিবরণ পশ্চিমবঙ্গের এই বিস্তৃত অঞ্চল প্রদক্ষিণ করলে বর্ণে বর্ণে মিলে যায়। কেবল ধনপতি সদাগরের উজানিনগর নয়, চাঁদ সদাগরের চম্পকনগরও এই অঞ্চলে। খুল্লনার পাত্র-নির্বাচন প্রসঙ্গে বণিকদের যেসব নাম ও বসতির উল্লেখ আছে, তা এই : চম্পকনগরের চাঁদ সদাগর, বর্ধমানের ধুস দত্ত ও সোম দত্ত, সাতগাঁ বা সপ্তগ্রামের রাম দাঁ, বড়শূলের হরি দত্ত, ফতে-পুরের রাম কুণ্ডু, কর্জনার হরি লাহা, ভাল্লকির সোম চন্দ্র। ধনপতি সদাগরের পিতার শ্রাদ্ধ উপলক্ষে উজানিতে বিভিন্ন অঞ্চলের বহু বণিকের সমাগম হয়েছিল। তাঁদের নামধামের তালিকা আরও বিস্তৃত—কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তার বর্ণনা দিয়েছেন। সেই তালিকাটি এই : বর্ধমানের ধুস দত্ত, চম্পাইনগরের চাঁদ সদাগর, লক্ষ্মী সদাগর, কর্জনার নীলাম্বর বণিক ও তাঁর সাত ভাই, গণেশপুরের সনাতন চন্দ, তাঁর ভাই গোপাল ও গোবিন্দ চন্দ, দশঘরার বাসুলা, সপ্তগ্রামের শ্রীধর হাজরা ও রাম দাঁ, সাঁকোর শঙ্খ দত্ত, বিষ্ণু দত্ত ও তাঁর সাত ভাই, কাইতির যাদবেন্দ্র দাস, জাড়গ্রামের রঘু দত্ত, তেঘরার গোপাল দত্ত, ত্রিবেণীর রাম রায় ও তাঁর দশ ভাই, লাউগাঁর রাম দত্ত, পাঁচড়ার চণ্ডীদাস খাঁ, খণ্ড ঘোষের বাসু দত্ত, গোতানের রাম দত্ত, ইত্যাদি—

একে একে বণিকের কত কব নাম
সাত শত বেণে আইসে ধনপতি ধাম॥

সাত শত বণিকের সমাগম হয়েছিল ধনপতি সদাগরের গৃহে। যে-সব গ্রাম থেকে তাঁরা এসে-ছিলেন, তার প্রায় প্রত্যেকটি আজও স্বনামে বর্তমান রয়েছে। বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর, বর্ধমান-হুগলী-হাওড়ায় গ্রামগুলি ছড়ানো। একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এলোমেলো-ভাবে ছড়ানো নয়, একটা ধারা অনুযায়ী যেন গ্রামগুলি বিন্যস্ত। অর্থাৎ দামোদর, অজয়, দ্বারকেশ্বর, সরস্বতী প্রভৃতি নদনদীর তীরে গ্রামগুলি প্রতিষ্ঠিত। সেখানকার গ্রামীণ সমাজে আজও বণিক-সম্প্রদায়েরই সমৃদ্ধি ও প্রতিপত্তি সর্বাধিক। গ্রামে পা দিলেই সবচেয়ে সমৃদ্ধিশালী, বড় বড় অট্টালিকাবহুল যেসব পাড়া দেখা যায়, সেগুলি গন্ধবণিক, তাম্বুলিবণিক সুবর্ণবণিক তন্তুবণিক প্রভৃতি বণিকসম্প্রদায়ের পাড়া। এগুলি সবই হল, মধ্যযুগের একেবারে প্রান্ত পর্যন্ত বাংলার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির ঐতিহাসিক নিদর্শন।

বাণিজ্যের ইতিহাস থেকে জানা যায়, আধুনিক যুগের মতো মধ্যযুগে 'free trade' বা 'অবাধ বাণিজ্য' বলে কিছু ছিল না। সামন্তরাজাদের বিধিনিষেধ ছিল যথেষ্ট এবং সেই সব নিষেধের দুরতিক্রম্য বাধা লঙ্ঘন করে, বণিকশ্রেণীর পক্ষে তখন সমৃদ্ধ হওয়া খুবই কঠিন ছিল। সামন্ত-বণিকের এই দ্বন্দ্বের দৃষ্টান্ত মধ্যযুগের ইতিহাসে কোথাও বিরল নয়। আমাদের দেশের বর্ণাশ্রমী সমাজে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হল, বণিকরা জাতিবর্ণগতভাবে চিরদিন উপেক্ষিত। সমাজের অবহেলা ও রাজার বিদ্বেষ, দুইই উপেক্ষা করে বণিকেরা নিজেরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠী গঠন করেছেন এবং Court-town বা রাজনগরের উপকণ্ঠে, অথবা দূরে দূরে নদীতীরের বন্দরে বন্দরে, তাঁরা স্বতন্ত্র বসতি, পত্তন ও নগর তুলেছেন। এত বাধা, এত অনাদর ও উপেক্ষা সত্ত্বেও, বাংলার বাণিজ্যের অবনতি হয়নি কখনও। তবে এই বাধার ফলে এদেশের সমাজে একটা বড় রকমের বিপত্তি ঘটেছিল মনে হয়। সেই বিপত্তির হাত থেকে, পরবর্তীকালে, অর্থাৎ আজও আমরা মুক্তি পেয়েছি বলে মনে হয় না। সেই বিপত্তি হল—বণিকেরা বাণিজ্য থেকে যে প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করেছেন, তা হয় মাটির তলায় পুঁতে ফেলেছেন, না হয় উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতায় ব্যয় করেছেন, মূলধন হিসেবে তা পণ্য-উৎপাদনের উদ্দেশ্যে নিয়োগ করেননি। তার জন্য এদেশের বাণিজ্যের এত উন্নতি সত্ত্বেও যন্ত্রপাতির উদ্ভাবন এবং

ইয়োরোপের মতো শিল্পবিপ্লব সম্ভব হয়নি। এর অন্যতম কারণ মনে হয়, এদেশের বণিকেরা নির্মম সামাজিক উপেক্ষার জন্য, নিজেরাও ক্রমে সংকীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে ডানাগুটিয়ে ফেলেছেন এবং সর্বসাধারণের বা সমাজের উন্নতি-অগ্রগতির কথা চিন্তা করবার মতো তেমন কোন প্রেরণা পাননি। দ্বিতীয় কারণ হল, এদেশের সমাজের কর্ণধাররা ও শাস্ত্রকারেরা সাধারণ মানুষের সামনে—"নেংটি পরে. দুবেলা দুমুঠো শাকান্ন খেয়ে" কাটানোর সরল জীবনযাত্রার নীতি-মাহাত্ম্য এত জোর গলায় প্রচার করে এসেছেন যে, সমাজে পণ্যবোধ বলেই কিছুই জাগেনি কোনদিন এবং যুগ যুগ ধরে বৃহত্তম মানুষের consumption-pattern বা পণ্যদ্রব্য ভোগের রীতি বদলায়নি—তার ফলে নতুন নতুন চাহিদা ও অভাবের সৃষ্টি হয়নি। দারিদ্র্য ও প্রকৃতিনির্ভর সারল্যকে এই নীতির দোহাই দিয়ে আমাদের সমাজে চিরস্থায়ী করা হয়েছে। শিল্পের প্রেরণা জাগেনি, যন্ত্র-উদ্ভাবন বা শিল্পবিপ্লব কিছুই ঘটা সম্ভব হয়নি।

মধ্যযুগের পরে ব্রিটিশ রাজত্বকালে যখন আধুনিক যুগের সূচনা হল এদেশে, তখন ঐতিহাসিক কারণেই বাংলাদেশই হল তার প্রাণকেন্দ্র। স্বভাবতঃই তাই নবযুগের অর্থনৈতিক মনোভাব নতুন নতুন বাণিজ্যিক উদ্যম-উদ্‌যোগের মধ্যে, সবার আগে এবং সবচেয়ে বেশী প্রকাশ পেল বাংলাদেশে। কিন্তু প্রকাশ পেল কি ভাবে ? বাংলাদেশে অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে বেনিয়ান ও মুৎসুদ্দিদের বিকাশ হল, সত্যিকার পুঁজিপতিদের দেখা গেল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী বেনিয়ানরা ছিলেন 'interpreter, head book-keeper, head-secretary, head broker, the supplier of cash and cash-keeper' আর যা ছিলেন, অর্থাৎ তাঁদের যে চরিত্র গড়ে উঠেছিল, তারও আভাস পাওয়া যায় তখনকার ঐতিহাসিক দলিলপত্র থেকে—"They knew all the ways, all the little frauds, all the defensive armour, all the articles and contrivances, by which abject slavery secures itself against the violence of power." অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যেই বেনিয়ানি করে অনেক বাঙালী প্রচুর বিত্ত ও সামাজিক প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অক্রূর দত্ত, হিদারাম ব্যানার্জি, বারাণসী ঘোষ, গোকুল ঘোষাল, দুর্গাচরণ মিত্র, দয়ারাম দত্ত, মনোহর মুখার্জি, মদন দত্ত প্রভৃতি অন্যতম। কলকাতা শহরের অনেক রাস্তা ও অলিগলি আজও এ'দের সেকালের সামাজিক প্রতিষ্ঠার স্মৃতি বহন করছে। বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও উনিশ শতকে অনেক বাঙালী আশ্চর্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ দ্বারকানাথ ঠাকুরের মতো উদ্‌যোগী বাঙালী ব্যবসায়ী সেযুগে আর কেউ ছিলেন কি না সন্দেহ। রামদুলাল দে, মতিলাল শীল, এ'রা বিশ্বব্যাপী এক সুবিস্তৃত বাণিজ্যের জাল বিস্তার করেছিলেন। এরকম প্রতিষ্ঠা, বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, সারা ভারতবর্ষে সেদিন আর কেউ পেয়েছিলেন কি না সন্দেহ। এমনকি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ক্ষেত্রে যাঁরা অগ্রদূত ছিলেন, তাঁরাও অনেকে নবযুগের এই নতুন অর্থনৈতিক প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রামমোহন রায় বেশ কিছুদিন তেজারতী কারবার ও বেনিয়ানি করেছিলেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাদের দেশে ছাপাখানা, বিশেষ করে বইয়ের ব্যবসার আদি-প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। 'ইয়ংবেঙ্গল' দলের স্বনামধন্য মুখপাত্রদের মধ্যে রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, তারাচাঁদ চক্রবর্তী প্রভৃতি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, তা কোন অংশে তাঁদের সামাজিক-সাংস্কৃতিক কৃতিত্বের তুলনায় কম গৌরবের নয়। এই সব ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত থেকে অন্ততঃ এইটুকু বোঝা যায় যে পশ্চিম থেকে অন্যান্য আদর্শগত ভাবধারার সঙ্গে 'free enterprise'-এর অর্থনৈতিক ভাবধারাও এদেশে আমদানি হয়েছিল এবং তা একশ্রেণীর বাঙালীকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু—এবং খুব বড়

"কিন্তু" হল—এই সব অনুপ্রেরণা ও উদ্যম-উদ্‌যোগের মধ্যে একটা মর্মান্তিক ট্র্যাজিডির বীজ নিহিত ছিল প্রায় গোড়া থেকেই। সেই ট্র্যাজিডি হল— free enterprise কোনদিনই প্রকৃত freedom বা স্বাধীনতা পায়নি—এমনকি পাবার আকাঙ্ক্ষাও তেমনভাবে বাঙালী ব্যবসায়ীদের মধ্যে প্রকাশ পায়নি—যদিও তার সামাজিক গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অনেকে অবহিত হয়েছিলেন। তখনকার উল্লেখযোগ্য সাময়িকপত্রগুলি, বিশেষ করে ইয়ংবেঙ্গলদলের পত্রিকাগুলি অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, পণ্যের লেনদেন বা commerce-এর বদলে তাঁরা বাঙালী ব্যবসায়ীদের পণ্য-উৎপাদনের দিকে বেশী করে মনোযোগ দেবার জন্য অনুরোধ করছেন। কিন্তু সে-সব আবেদন অরণ্যে রোদনের মতো ব্যর্থ হয়েছে। কেন এই ট্র্যাজিডি বাংলার অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ঘটেছে, আজ তা বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন।

ইয়োরোপের রেনেসাঁসের যুগের মতো, আমাদের দেশেও নবযুগের দুটি সক্রিয় গতিশীল শক্তির আধার হল **বিত্ত** ও **বিদ্যা**। এই দুই শক্তির জোরে নতুন সমাজের গড়ন আরম্ভ হল। সামাজিক প্রতিষ্ঠার মাপকাঠি হল এই দুটি। এর মধ্যে যে কোন একটির জোরেই সমাজে প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায়।। আর এই দুটিরই অর্থাৎ বিত্ত ও বিদ্যার মণিকাঞ্চন-যোগ কারও জীবনে ঘটলে তো কথাই নেই — তিনি মধ্যযুগের দেবতার মতো সমাজে প্রতিষ্ঠা পাবেন। বাঙালীরা বিত্ত অর্জন ও সঞ্চয় করলেন বটে, কিন্তু তার অধিকাংশ উবে দিলেন বিলাসিতায় ও উচ্ছৃঙ্খলতায়, পারিবারিক আত্মকলহের মামলা-মোকদ্দমায়, এবং বাকিটুকু মাটিতে পুঁতে ফেলে, অর্থাৎ জমিদারী কিনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ফাঁদে পা দিলেন। বাঙালীর সঞ্চিত বিত্ত সক্রিয় মূলধন হল না, শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে নিযুক্ত হল না তেমন। বাকি রইল **বিদ্যা**। বিত্তের মূলধন ছেড়ে আমরা বিদ্যার মূলধনটি আঁকড়ে ধরলাম। ইংরেজরা সেইদিকেই আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন। নবযুগের এই বিদ্যাও মূলতঃ হল বণিক মনোভাবাপন্ন। অর্থাৎ বিদ্যা যাই হোক তাতে ক্ষতি নেই, কেবল স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেটে নানারকমের সব বাহারে 'লেবেল' মারা থাকলেই হল। প্রথম যুগে আমরা বিদ্যার পুঁজিপতি হয়ে, আশপাশের বিহার উড়িষ্যা আসাম প্রদেশে তো বটেই, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে কর্তৃত্ব করতে গেলাম। তারপর প্যাকেট-লেবেল আঁটা বিদ্বানের সংখ্যা এত বেড়ে যেতে লাগল যে প্রথম যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের যদি Capitalists of Education বলা যায়, পরবর্তী যুগের শিক্ষিত বাঙালীদের নিঃসন্দেহে বলা যায় Educated Proletariat. এদের শিক্ষিত মধ্যবিত্তই বলুন, অথবা বিদ্বান বিত্তহীনই বলুন, গোড়াতে যে সমাজের 'মাঝারি' শ্রেণীর কথা বলেছি. বিদ্যার ক্ষেত্রেও আজ বাংলাদেশে সেই মাঝারিদের সংখ্যা বন্যাস্রোতে বেড়ে যাচ্ছে। এটা অবশ্য বর্তমান সমাজেরই একটা বিকৃত উপসর্গ, কেবল বাংলাদেশের নয়। এই উপসর্গ সম্বন্ধে একজন স্বনামধন্য সমাজবিজ্ঞানী কার্ল ম্যানহাইম যা বলেছেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য ঃ

"Education is one of the major areas in which the spirit of inquiry is on the decline . . . The retailing of knowledge in standard packages paralyses the impulse to question and to inquire. Knowledge acquired without the searching effort becomes quickly obsolescent, and a civil service or a profession which depends on a personnel whose critical impulse is benumbed, becomes rapidly inert and incapable of remaining attuned to changing circumstances (Sociology of Culture, P 167).

'Research' বা গবেষণার মধ্যেও আজকাল যতটা আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা বা 'Spirit of

inquiry' না থাকে, তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে 'লেবেল' পাওয়ার আগ্রহ ও বাস্তবতা। সারা ভারতবর্ষে এক সময় বিদ্যার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, এবং এখনও অনেকটা আছে বলেই, সঙ্কট বাংলাদেশে তাই খুব প্রকট হয়ে উঠেছে। বিত্তের মূলধন ছেড়ে কেবল বিদ্যার মূলধন নিয়ে আমরা একশ-দেড়শ বছর আগে যে-পথে যাত্রা করেছিলাম, সে-পথ তখন যেমন সহজগম্য ছিল, এখন আর তা নেই। সে-পথ এখন অনেক প্রতিদ্বন্দ্বীর কলরবে মুখর। তার জন্য আমাদের নৈরাশ্যচেতনা ক্রমেই তীব্র হচ্ছে এবং আমাদের অসহায় আক্রোশ কখন সঙ্কীর্ণ chauvinism-এর চোরাগলিতে, কখনও বা আত্মঘাতী কলহে আত্মপ্রকাশ করছে। কিন্তু নৈরাশ্য বা আক্রোশ কোনটাই আমাদের পথ দেখাবে না। স্থিরভাবে আমাদের এই সমস্যা সম্বন্ধে চিন্তা করা প্রয়োজন এবং তার চেয়েও বেশী প্রয়োজন কাজ করা। সমস্যা বা সঙ্কট যখন প্রকট হয় তখন পরোক্ষভাবে তা মঙ্গলের জনাই হয়। সমাজের ইতিহাস অন্ততঃ সেই কথা বলে। কারণ সঙ্কটের মধ্যেই সমাজ-মানসে উত্তরণের চেতনা জাগে, সেই চেতনা নতুন নতুন কাজকর্মে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। সেই চেতনা ও প্রেরণারও আজ প্রকাশ হচ্ছে বাংলাদেশে। সেইটাই আশার কথা।

ভারতীয় সঙ্গীতে রাগরাগিণীর মূর্তি-কল্পনা

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

রাগ-রাগিণীর মূর্তি-চিন্তা নিছক কল্পনা একথা অনেক চিন্তাশীল লোকের মুখেও শুনেছি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—এই বিশ্বচরাচরও কি কল্পনার পরিণতি নয়! আচার্য শঙ্কর বা দার্শনিক গৌড়পাদের কথা ছেড়ে দিলেও জীবনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় আমরা দেখি পৃথিবীর কোন জিনিসেরই দীর্ঘস্থায়িত্ব নেই। পশুপক্ষী, কীটপতঙ্গ; মানুষ সকল প্রাণীরই যেমন জন্ম আছে, তেমনি মৃত্যু আছে। নিজেকে অমর বলে দাবী করার অধিকার পৃথিবীতে কারুরই নেই। মানুষ মনে যা কল্পনা করে তাই বাস্তবে পরিণত হয়, কল্পনা বা চিন্তাকে বাদ দিয়ে সে কোন কাজই করতে পারে না। সৃষ্টির ক্ষেত্রে কল্পনার আসন চিরদিনই সমুন্নত থাকবে।

উপনিষৎ বলে বিশ্ববৈচিত্র প্রথমে রূপ পরিগ্রহ করে বিরাট মন ঈশ্বরের কল্পনাসমুদ্রে, আন্তর কল্পনাই বাস্তব নাম ও রূপে গ্রহণ করে পরে। শিল্প সাহিত্য দর্শন কাব্য ধর্ম সবই রূপায়িত হয় বুদ্ধিজীবী মানুষের অন্তর্লোকে প্রথমে, পরে বিকাশ লাভ করে বাইরের জগতে। সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীদের রূপ-কল্পনার মর্মকথাও তাই। শিল্পী কেবলই মানস রূপকে নিয়ে আত্মতৃপ্ত থাকতে পারে না, সে চায় তার বাইরের প্রতিফলন নিজের সঙ্গে সঙ্গে অপরকেও আনন্দানুভূতির অংশভাগী করতে।

আসলে সৌন্দর্যের সাধনা থেকে সৃষ্টি হয় শিল্প, সাহিত্য ও কাব্যের সুষমা, তাই শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি একদিক থেকে অধ্যাত্ম সাধনারই পথচারী। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'যথার্থ সৌন্দর্য সমাহিত সাধকের কাছেই প্রত্যক্ষ, লোলুপ ভোগীর কাছে নহে। যে লোক পেটুক সে ভোজনের রসজ্ঞ হইতে পারে না'। প্রকৃত রসজ্ঞ সংযত শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি মাত্রেই তপস্বী, তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতিরই রূপচর্যায় আত্মসমাহিত থাকেন। শিল্পী ছবি আঁকেন, সাহিত্যিক ও কবি সাহিত্য ও কাব্য রচনা করেন তাঁদের অন্তরের অপার্থিব উচ্ছল আনন্দকে বাস্তবে রূপায়িত করে আস্বাদন করার জন্য। বিশ্বস্রষ্টা, ভগবান সত্য-শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণ মূর্তি। শিল্পী, সাহিত্যিক ও কবি ঐ মূর্তিরই ধ্যান ও আরাধনা করেন স্বচ্ছ মন ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে, তাই সৃষ্টিও সার্থক হয় তাঁদের রসানুভূতির ভেতর দিয়ে। তাই চিত্রকরের মানস মূর্তি, ভাস্কর ও সঙ্গীতশিল্পীর কাল্পনিক প্রতিমা রূপ পরিগ্রহ করে প্রাণময় হয়ে ওঠে। শিল্পীর আকুলতাই নবসৃষ্টির চেতনাকে করে উদ্বুদ্ধ। তারপর কারণ থেকে হয় সূক্ষ্মের বিকাশ ও সূক্ষ্ম থেকে হয় স্থূলের রূপায়ণ।

সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীদের মূর্তি-কল্পনার পেছনে মনোবৈজ্ঞানিকী একটি ধারা (psychological process) আছে ও সেই ধারাকে মাধ্যম করেই কারণ থেকে সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্ম থেকে স্থূলের হয় বিকাশ। সঙ্গীতশাস্ত্রে এই ধারারই বিশ্লেষণ করে পরিচয় দেওয়া হয়েছে একটু ভিন্নভাবে। শাস্ত্রকাররা বলেছেন সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীদের কাঠামো স্বরের বিন্যাস দিয়ে সৃষ্টি হলেও তার মধ্যে শব্দময় রূপটাই সব-কিছু নয়, তার মধ্যে একটা ভাব-ময় রূপও আছে অন্তর্নিহিত হয়ে। বৈদিক যুগে সামগানের ঝঙ্কারে যজ্ঞবেদীর অগ্নিতে আহ্বান করা হত দেবতাদের। মন্ত্ররূপী দেবতারা গানের সুরে হতেন পরিতৃপ্ত, শব্দময় সঙ্গীত তখন প্রাণময় করত যজ্ঞানুষ্ঠানকে। অবশ্য রাগ-রাগিণীর কল্পনা বৈদিক যুগের সমাজে ছিল না,

অথচ সামগান শ্রোতৃবর্গের চিত্তকে করত আনন্দাপ্লুত, পশুপক্ষীও সে গানের সুরে হত আত্ম-বিমোহিত। ক্ল্যাসিক্যাল যুগের সূচনায় (খৃষ্টপূর্ব ৬০০) দেখা দিল গান্ধর্বশ্রেণীর গান, 'জাতি' রূপে হল রাগের সৃষ্টি ও ছন্দ, রস, স্থান, মূর্ছনা করল তাদের সমৃদ্ধ। রামায়ণের যুগে (খৃষ্ট পূর্ব ৪০০) জাতিগানের বিকাশ সার্থক হয়ে উঠল শুদ্ধ সাত জাতিরাগকে নিয়ে। মহাভারত ও হরিবংশের যুগে (খৃষ্টপূর্ব ৩০০—২০০) হল গ্রামরাগের বিকাশ, ছাঁটি গ্রামরাগ ভারতীয় সঙ্গীত-শিল্পকে করল লীলায়িত। কিন্তু রাগের শব্দময় মূর্তিই ছিল সার্থক হয়ে, দেবময় রূপের কল্পনা শিল্পীর হৃদয়ে তখনো ঠিক জাগে নি, কিন্তু গান ছিল অধ্যাত্ম মহিমালোকে প্রদীপ্ত। ক্রমে খৃষ্টীয় শতাব্দীর অরুণোদয়ে দেখা দিল গ্রামরাগের পাশাপাশি জাতিরাগের বিকাশে সমৃদ্ধি। ভরত নাট্যশাস্ত্র রচনা করলেন (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) পূর্বশৈলীকে উজ্জ্বল করে সঙ্গীতের গৌরবময় আসন দিল নাটক। সাতটি জাতিরাগের পাশে এগারটি বিকৃত জাতিরাগের হল অভ্যুদয়। আঠারটি জাতিরাগ শাস্ত্রীয় মর্যাদায় হল অভিনন্দিত, কিন্তু রাগের মূর্তিকল্পনার আকুতি তখনও শিল্পী ও কবি-মনের মধ্যে দেখা দেয় নি। ভরতের যুগে (খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দী) জাতিরাগের পাশে ছিল মাগধী, অর্ধমাগধী, পৃথুলা, সম্ভাবিতা প্রভৃতি গীতিরূপ ও তার পাশাপাশি ছিল ব্রহ্মগীতি (কপাল, কম্বল প্রভৃতি), ধ্রুবাগীতি প্রভৃতির সমাবেশ, অধ্যাত্ম ভাবপ্রেরণার ছিল তারা সচল উৎস, কিন্তু রাগ বা গীতির দেবতাময় রূপের চিন্তা তখন মানুষ করেনি, অচ্ছ সঙ্গীতে তথা রাগে ও গানে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা তারা করেছে।

ক্রমে এল কোহল, দত্তিল, যাষ্টিক, প্রভৃতির যুগ। অনেকে কোহলাচার্যকে বলেন রাগের রূপ-কল্পনার পথিকৃৎ, কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনা তা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এল মতঙ্গের যুগ। খৃষ্টীয় (৫ম-৭ম অব্দ)। দেশীয় ও জাতীয়—এমন কি বিদেশীয় সুর হল অভিজাত 'রাগ'মর্যাদায় আসনে অধিষ্ঠিত, নবজাগরণের হল যুগ সৃষ্টি, কিন্তু রাগের মূর্তি-কল্পনার আকুতি তখনো সমাজে আসে নি। তারপর এল পার্শ্বদেবের যুগ (খৃষ্টীয় ৯ম—৭ম অথবা ১১শ অব্দ)। পার্শ্বদেবে সঙ্গীতসময়সারে দেখা দিল দেশী রাগগুলির শাস্ত্রীয় অভিজাত রূপ। ভৈরব এল, মালবকৌশিক, হিন্দোল, সৈন্ধবী, ককুভ প্রভৃতি করে উত্তর-ভারতীয় ও দক্ষিণ-ভারতীয় স্থানীয় সুর তথা রাগগুলির হল সমাবেশ। গুর্জরী, তোড়ী, বরাটী তখন বিচিত্র রূপ নিয়ে আসন পেতেছে। তুরুষ্কদেশের কিংবা সিথীয়ান জাতির সঙ্গে ভারতের হয়েছে মিত্রতা, তাঁদের সঙ্গীত-উপাদানও পেল ভারতীয় সমাজে স্থান। রাগগুলির নির্বাচনে শাস্ত্রীয় শাসন তখন প্রবল; কার্য-কারণ-বিশ্লেষণও রাগগুলিকে করেছে সবল ও সংযত, কিন্তু রাগের দেবতাময় রূপের তখনও হয়নি পরিকল্পনা, অথচ প্রার্থনা ও মুক্তি কামনার আকুতি সঙ্গীতে তখন জীবন্ত।

তারপর বিশেষভাবে সঙ্গীতে এল শার্ঙ্গদেবের যুগ (খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে)। শাস্ত্রীয় লক্ষণে সমৃদ্ধ করলেও তিনি রাগগুলিকে করলেন রস ও ভাব মহিমায় সমুজ্জ্বল। অবশ্য 'রাগিণী' শব্দটির বিকাশ তখনো সমাজে হয় নি, কিন্তু কার্য-কারণ সূত্র ছিল অনুস্যূত রাগগুলির প্রকৃতি-নির্বাচনের বেলায়। যেমন ভৈরব ও ভৈরবীর সৃষ্টিকেন্দ্র বলা হয়েছে ভিন্নষড়জ-গ্রামরাগকে। খৃষ্টীয় ৫ম থেকে ৯ম ১১শ শতাব্দীর গুণী মতঙ্গ ও পার্শ্বদেবও এই কার্য-কারণ তথা জন্য-জনকনীতির পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু তা আরো মূর্ত হয়ে উঠেছে খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দীর সমাজে শার্ঙ্গদেবের সময়। কিন্তু ধ্যানমন্ত্রের পাশাপাশি চিত্র-রূপের কল্পনা তখনও সমাজে হয়নি। রাগে রসরূপ ও অধ্যাত্ম পরিবেশের উদাহরণ দিতে গেলে ভৈরব ও ভৈরবীর সৃষ্টি-উৎসের কথাই বলি। শার্ঙ্গদেব সঙ্গীত-রত্নাকরে বলেছেন ঃ

হেমন্তে প্রথমে যামে বীভৎসে সভয়ানকে।

সার্বভৌমোৎসবে গেয়ো ভৈরবস্তং সমুদ্ভবঃ।
ধাংশো মান্তো রি-পত্যন্তঃ প্রার্থনায়াং সমস্বরঃ ।।

ভিন্নষড়জ-গ্রামরাগে রস-বিকাশ হল বীভৎস ও ভয়ানক, এবং উৎসব ও প্রার্থনার বিনিয়োগ থাকায় শান্তরসেরও অনুস্যূতি বুঝতে হবে। তবে বীভৎস ও ভয়ানক এখানে অমঙ্গলের সূচনা নয়, বরং পবিত্র শান্তরসের সহকারী, সুতরাং নিবেদের পরিপোষক। গ্রামরাগের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে "সার্বভৌমোৎসবে গেয়ঃ", আর ভৈরবরাগ তা থেকে বিকশিত ('ভৈরবস্তং সমুদ্ভবঃ'), সুতরাং তাও অধ্যাত্ম পরিবেশসম্পন্ন পবিত্র ঃ "প্রার্থনায়াং সমস্বরঃ"। ভৈরবী ভৈরবের সম-প্রকৃতিক। ভৈরবের সম্বন্ধেও বলা হয়েছে ঃ "প্রার্থনে ভৈরবঃ স্মৃতঃ" আর ভৈরবীর সম্বন্ধে ঃ "দেবার্চি প্রার্থনায়াং তু ভৈরবী বিনিযুজ্যতে"। গ্রামরাগ ভিন্নষড়জ, কিংবা তার জন্য রাগ ভৈরব ও ভৈরবী অধ্যাত্ম সাধনার অনুকূল হলেও তাদের কিন্তু শব্দময় রূপের কোঠায়ও আবদ্ধ করে রাখা হয়েছে, দেবতাময় রূপের কোন কল্পনা করা হয় নি।

রাগে রস ও ভাবের অনুপ্রবেশই তার মূর্তিকল্পনায় শিল্পী ও কবিকে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে। ভরত নাট্যশাস্ত্রে রসকে বলেছেন ঃ "আস্বাদ্যত্বাৎ"—আস্বাদন তথা অনুভূতির বস্তু। কিন্তু রসের স্থায়ীত্ব গুণ থাকা চাই, তবেই তা অনুভূতিকে প্রাণবান ক'রে তোলে ও বাসনায় উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। রস সম্বন্ধে ভরত বলেছেন ঃ

শৃংগার-হাস্য-করুণ-রৌদ্র-বীর-ভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্‌ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ ।।

অর্থাৎ রস আটটি ঃ শৃংগার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বীভৎস ও অদ্ভুত। এই আটটি রস নাট্যের মতো সঙ্গীতের বাহ্যটি শ্রুতিতে ও সাতটি স্বরে লীলায়িত। ভরত শান্তরসের কথা উল্লেখ করেন নি, তিনি শৃংগারে রতিকে স্থায়িভাব স্বীকার করে শৃংগারকে শ্রেষ্ঠ রস হিসাবে বর্ণনা করেছেন ঃ "রতি স্থায়িভাব প্রভব"। শান্তরসের স্থায়িভাব নেই বলে ভরত শৃংগারকে গণ্য করেছেন। কিন্তু অভিনবগুপ্ত 'অভিনবভারতী' ভাষ্যেও একথা স্বীকার করেছেন ঃ "অতএব শান্তস্য স্থায়িত্বোহ পাপ্রাধান্যম্" কিন্তু কি জানি কেন, নাট্যশাস্ত্রের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের শেষে ভাষ্যে তিনি নবরসের অবতারণা করে বলেছেন ঃ "এতে নবৈব রসাঃ, পুমর্থোপযোগিত্বেন, রঞ্জনাধিকোন বা ইয়তামেব উপদেশ্যত্বাৎ। তেন রসান্তর সম্ভবেহপি ×"। অনেকে অভিনবগুপ্তের এই অভিমত বা অংশটিকে প্রক্ষিপ্ত বলেন। কেননা লক্ষ্মীধর, সারদাতনয় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ভরতকেই সমর্থন করেছেন। যেমন লক্ষ্মীধর বলেছেন ঃ "বিক্রিয়াজনকা এব রসা ইতি অষ্টৌ রসা ভরতমতে। শান্তস্য নির্বিকারত্বাৎ ন শান্তং মেনিরে রসম্' ইতি শান্তস্য রসাত্বাভাবাৎ অষ্টাবেব রসাঃ সংগৃহীতাঃ"। কিন্তু ধনিক ও বৈষ্ণব আলঙ্কিকরা শান্তকে স্বীকার করে নবরসের পরিচয় দিয়েছেন ভরতোক্ত আটটি রসের পরিণতি আটটি ভাব ও সেগুলি হল ঃ রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়। এগুলি আটটি রসের স্থায়িভাব এই আটটি রস ও স্থায়িভাব নাকি ভরতের পূর্বগ (খৃষ্টপূর্বাব্দ) নাট্যশাস্ত্রী ব্রহ্মা বা ব্রহ্মভরতও স্বীকার করতেন ঃ "এতে হ্যষ্টৌ রসাঃ প্রোক্তা দ্রুহিণেন মহাত্মনা"। খৃষ্টীয় শতাব্দীর নাট্যশাস্ত্র হল সংগ্রহগ্রন্থ ঃ "নাট্যস্যাস্য প্রবক্ষ্যামি রস ভাবাদিসংগ্রহম্"।

স্থায়িভাব ছাড়া রসের আবার ব্যভিচারি ভাব আছে ও তারা সংখ্যায় ৩৩টি; যেমন নির্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, আলস্য, দৈন্য, স্মৃতি, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার প্রভৃতি। তাছাড়া সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক

ভেদে রস-বিভাগ আবার তিন রকম। ভরতের মতে সাত্ত্বিক ভাব আটটি : স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ বেপথু বা কম্পন, অশ্রু, বিবর্ণতা ও প্রলয়। সবিকল্পক ও নির্বিকল্পকভেদে রসজ্ঞান আবার দু'রকম। নির্বিকল্পক জ্ঞান নির্ধর্মক, সুতরাং তাতে মানসপ্রত্যক্ষ হয় না। সবিকল্পক রসানুভূতিতে জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান এই ত্রিপুটি থাকে। বিভাবাদির জ্ঞান সবিকল্পক। কিন্তু সামগ্রিক রসানুভূতিকে নির্বিকল্পক বা সবিকল্পক কোনটাই বলা যায় না, কেননা সেখানে দুয়ের নির্বাচন নাই, ভেদাভেদশূন্য অখণ্ডই রসজ্ঞান এবং একেই পরমব্রহ্মরূপ পরমানন্দ বলা হয়েছে। মধুসূদন সরস্বতী অদ্বৈতবাদী হলেও সাধনার ক্ষেত্রে তিনি সাকারবাদী। তিনি নির্বিকল্পক-সবিকল্পকহীন পরমানন্দ রস সম্বন্ধে তাঁর 'ভক্তি রসায়ন' গ্রন্থে বলেছেন : "ভগবান পরমানন্দস্বরূপ হি × রসতামেতি" (১।১০)। এখানে রসই ভগবান, এখানে আস্বাদ আস্বাদনকারী নেই, একমাত্র 'পরম-আস্বাদন' বা অনুভূতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিসন্দর্ভ, প্রীতিসন্দর্ভ, প্রভৃতি বৈষ্ণব রসগ্রন্থে শান্তরসকে পরমাস্বাদন-রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এই শান্তরসই নির্বেদ তথা বৈরাগ্য ও সমাধির উদ্বোধক, আবার প্রেমস্বরূপ—দুইই।

ভোজরাজের মতে 'রস' একটি, ও সেটি 'প্রেম' আর অন্যান্য রস উপচার মাত্র। নাট্যশাস্ত্রে শৃঙ্গারকে আদিরস বলা হয়েছে; ভোজরাজের মতে শৃঙ্গার অর্থে পরমপ্রেম বোঝায় বলেই শ্রেষ্ঠ। এই প্রেমের কোন বিষয় নেই, কেবলই আস্বাদন-স্বরূপ ও অতীন্দ্রিয়। শৃঙ্গাররসকে অভিমানও বলে, কেননা অহংকারের পরিণতি যে শোক-দুঃখ, তাকেও সুখ-স্বরূপে বা আনন্দ-রূপে অনুভব করা হল অভিমানের কাজ। সঙ্গীতে রাগ রাগিণীর মধ্যে যেখানেই শৃঙ্গাররসের লীলায়ণ দেখা যাবে সেখানেই তাই বিকৃত স্ত্রী-পুরুষ-সম্পর্কবর্জিজত সুখ বোঝাবে না, পরন্তু শাশ্বত প্রেম বা পরমানন্দই বোঝাবে। ভরতও তাই শৃঙ্গারের ব্যভিচারি-ভাব হিসাবে নির্বেদ বা বৈরাগ্যকে ইঙ্গিত করেছেন। শৃঙ্গারের অভিমান বা অহংকার তাই সঙ্গীত-রসিকের অন্তরে সাত্ত্বিক ভাব ও আত্মানুভূতির আনন্দই জাগিয়ে তোলে। তবে এই আনন্দ সকল সম্পর্কবিমুক্ত প্রেমানুভূতি। প্রেমই বিশ্বোত্তীর্ণ রস। ভট্ট নৃসিংহ শৃঙ্গার-রসের অভিনবত্ব ও পারমার্থিকত্ব সম্বন্ধে বলেছেন : "যেন রমাতে, যেন অনুকূলবেদনীয়তয়া দুঃখমপি সুখরূপেন অভিমন্যতে, যেন রসিকৈরহংক্রিয়তে, যেন শৃঙ্গম্ উচ্ছ্রয়ো রীয়তে, স খলু তাদৃশোদস্তি × ×"। অবশ্য ভোজরাজ প্রেমকে অখণ্ড রস বলে স্বীকার করলেও ভাবানুযায়ী বিচিত্র রসের সত্তা স্বীকার করেছেন। এই বিচিত্রকে তিনি 'বিশেষ' বলেছেন। বিচিত্র রসের মধ্যে আটটি বা নটি স্থায়ি, তেত্রিশটি সঞ্চারী ও আটটি সাত্ত্বিক। অবশ্য এবিষয়ে তিনি ভরতকেই অনেকটা অনুসরণ করেছেন। বামণ, রুদ্রতা, দণ্ডী এ'রাও রস সম্বন্ধে বিচার করেছেন। প্রেয়, প্রীতি বা বাৎসল্য, বিলাস প্রভৃতি রস-বিকৃতি নিয়েও তাঁরা আলোচনা করেছেন।

এক্ষণে সঙ্গীতে রাগ-রাগিণীদের আলোচনায় রস-বিকারের এত ঘনঘটা কেন যদি প্রশ্ন ওঠে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাগ-রাগিণীদের রস ও ভাবই তাদের ধ্যান ও মূর্তি-রচনার কাজে কবি ও শিল্পীদের প্রেরণা জুগিয়েছিল। হনুমন্মতে ভৈরবকে আদিরাগ বলা হয়, কেননা তাতে ভয়ানক, করুণ, ও বীভৎস রসের সম্ভার থাকলে শৃঙ্গার অথবা পরবর্তী শান্তরসের প্রাধান্যই দেখা যায়, যার ফলে করুণ, ভয়ানক প্রভৃতি রসও নির্বেদ বা বৈরাগ্যেরই উদ্বোধক ও নিয়ামক—পরন্তু প্রতিরোধক নয়। সঙ্গীত-রত্নাকরের ভাষ্যকার সিংহভূপাল একখানি রসশাস্ত্রও রচনা করেছিলেন, তার নাম 'রসার্ণব-সুধাকর'। তাতে কিন্তু তিনি সম্ভবতঃ ভরতকে অনুসরণ ক'রে শান্তরসানুভূতির স্থায়িত্ব বা স্থায়িভাবকে ঠিক মেনে নিতে পারেন নি, কেননা তাতে নাকি নির্বেদ বা বাসনারাহিত্যের সৃষ্টি হয় না। অবশ্য পরবর্তী গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ

শান্তরসকেই শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

রস ও ভাব-বিদগ্ধ মন নিয়ে রসিক কবি ও শিল্পী রাগ-রাগিণীদের ধ্যান ও চিত্র রচনা করতে আরম্ভ করে খৃষ্টীয় ১৫শ-১৬শ অব্দের আগে নয়। শব্দময় গান তখন প্রাণময় হয়ে দেবতাময় রূপে আত্মপ্রকাশ করল, আর সঙ্গীত তখনি রূপ-পরিগ্রহ করল অধ্যাত্ম সাধনার আকারে। গানের মধ্যে ধ্যান পেল আসন ও ধ্যানের মাধ্যমে গীত-রসিক পেল শাশ্বত জ্ঞানের অনুভূতি। মূর্তি বা চিত্র তো প্রতীক (symbol) ছাড়া আর কিছু নয়। প্রতীক প্রকাশক অথচ ছায়া, কিন্তু কায়ারই সে প্রতিচ্ছায়া। তাই আরোপিত বা কল্পিত বস্তুকে ধরে সুর-সাধক এগিয়ে চলেন পরমলক্ষ্যের পথে ও পরিশেষে কল্পনাই দেয় বাস্তবের সন্ধান। রাগ-রাগিণীদের চিত্র ও সুর-ঝঙ্কার পারস্পরিক সহায়তা দিয়ে অন্তরের ভাবকে দেয় আকার ও করে গতিরজ্জুল। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন : 'চিত্র ভাবকে আকার দেয় এবং সঙ্গীত ভাবকে গতি দান করে। চিত্র দেহ এবং সঙ্গীত প্রাণ'।

ক্রমে সঙ্গীতের জগতে রাগ-রাগিণীদের প্রতিফলন হল চিত্রে ও চিত্রের উদ্বোধক হিসাবে সূক্ষ্মদর্শী কবিরা রচনা করলেন সাহিত্য-সম্ভার দিয়ে রাগ-রাগিণীদের ধ্যানমন্ত্র। গঙ্গা ও যমুনার মতো দুয়ের মিলন হল রাগ-রাগিণীদের স্বরসজ্জায়; প্রদীপ্ত হল সাধকের প্রেরণা ও নিবন্ধ হল তার দৃষ্টি সুর ও কথার প্রাণকেন্দ্রে। সঙ্গীতের কৌলিন্য হল চিরসমুজ্জলতায় পূর্ণ। চিত্রকলায় রাগ-রাগিণীর রূপায়ণ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ চিত্র-সমালোচক অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় বলেন : 'আমাদের দেশের সুপ্রাচীন সংগীত-শাস্ত্রজ্ঞদের একটি 'থিয়োরি' আছে। এই 'থিয়োরি' অনুসারে প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীর একটি মানস-মূর্তি আছে। প্রত্যেক রাগ বা রাগিণীর এই মানস-মূর্তি বা প্রতিকৃতিকে সেই বিশেষ রাগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বলা হয়।×× রাগ-রাগিণীর অবয়ব বা মূর্তি সম্পর্কে তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায় আর একখানি প্রামাণ্য গ্রন্থে (নারদের 'পঞ্চম-সারসংহিতা' ছাড়া)। সেখানি হল পণ্ডিত সোমনাথ (১৬০৯) বিরচিত 'রাগ-বিবোধ'।) × × লেখক রাগ-রাগিণীর শ্বিবিধ মূর্তির বিষয় বলেছেন — মধুর স্বর-বিস্তারে কোন রাগকে মনের মধ্যে মূর্ত করে তোলারই নাম 'রূপ'। এই রূপ বা মানস-মূর্তি দুই প্রকার (১) নাদাত্মক, অর্থাৎ নাদ বা শব্দ যার আত্মা বা সার বিষয়বস্তু, (২) দেবাত্মক—অর্থাৎ মূর্তি-মান সুরই যার আত্মা বা সার বিষয়বস্তু। এই গ্রন্থে লেখক সংস্কৃত শ্লোকে রচিত কতকগুলি রাগ বা সুরের মূর্তি বা রূপের বর্ণনা দিয়েছেন। এই সব শ্লোকে বর্ণিত বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর মূর্তিকে কল্পনা ক'রে চিত্র-শিল্পীরা বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর চিত্র এঁকেছেন'।

রাগমালা তথা রাগ ও রাগিণীদের চিত্র বিশেষভাবে রাজস্থানী-চিত্র হিসাবে রাজপুতনার শিল্পীদেরই শিল্প-প্রতিভার অবদান। বিকানীর থেকে গুজরাটের সীমানা, যোধপুর থেকে গোয়ালিয়র ও উজ্জয়িনী পর্যন্ত রাজস্থানী চিত্রকলার বিকাশের পরিধি। ডাঃ কুমার স্বামী তাঁর অবিস্মরণীয় অবদান 'রাজপুত চিত্রকলা' (রাজপুত পেন্টিং, অক্সফোর্ড, ১৯১৬) পুস্তকে উল্লেখ করেছেন : Rajasthani paintings are those works which have been executed to Rajputana, from Bikaner to the border of Gujrat, and from Jodhpur to Gwalior and Ujjain. We either know, or may infer that the great centres of Rajasthani painting have been Jaipur, Orcha, and Bikaner, and presumably Udaipur and Ujjain, possibly also Mathura at an earliest date". শ্রদ্ধেয় কুমার স্বামীই রাজপুত-চিত্রকলার মাধুর্য ও বৈশিষ্ট বিশ্বের শিল্প-সৌন্দর্যসেবীদের সামনে প্রথমে প্রকাশ করেন। তিনি রাজপুত-চিত্রকলাকে রাজপুতনা ও পঞ্জাব-হিমালয়ের 'হিন্দু চিত্র'

বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর অভিমতে রাজস্থানী চিত্রকলার অভ্যুদয়-কাল খৃষ্টীয় ১৩শ অব্দ থেকে আরম্ভ বলেছেন : "Its period may be taken as firm about the beginning of the 13th century A.D.—When the Rajputs, dispossessed of capital cities such as Delhi * * to the middle of the 19th century."

শ্রদ্ধেয় পার্সি ব্রাউনের অভিমতও তাই। অবশ্য তিনি রাজপুত চিত্রকলার সৃষ্টি ও বিকাশ-পরিধির সময় নির্ণয় করেছেন খৃষ্টীয় ১৫৫০ থেকে ১৯০০ অব্দ এবং এই চিত্রকলাকে ভারতেরই নিজস্ব বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন : "This Rajput painting, for that is the title by which it has become designated, is essentially Hindu in expression, and in many aspects demonstrates that it is the indigenous art of India, a direct descendant of the classic frescos of Ajanta."

রাজস্থানী ছাড়া পাহাড়ী, মোগল ও মোগল-পরবর্তী রাগ-রাগিণীদের চিত্রকলারও যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। পাহাড়ী চিত্রকলার বিকাশ জম্বু থেকে আলমোড়া পর্যন্ত স্থানকে জুড়ে হয়েছিল বলে অনেকের ধারণা। এই বিস্তৃত পরিধির মধ্যে পার্বত্য-অঞ্চল জম্বু ও কাঙড়া চিত্রকলার অবদানই স্মরণীয়। [1] সম্ভবত খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষের দিকে দিল্লী, আজমীর ও মহোবের পতনের পরে সেখানকার রাজপুতরা জম্বু, কাঙড়া প্রভৃতি উত্তর-ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাঁদের মধ্যে অনেকে ছিলেন শিল্পী, কিন্তু নীচ জাতি ও সাধারণ অবস্থাসম্পন্ন। জম্বু অবশ্য কাশ্মীর রাজ্যের অধিকারে ছিল। বিশেষ করে জম্বু ও কাঙড়া উপত্যকায় যে সব শিল্পী তাদের শিল্পাবদানে ভারতের ললিতকলার ভাণ্ডারকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছিলেন তাঁদের শিল্পকলাকে পরবর্তী শিল্পজ্ঞানীরা উত্তরশ্রেণী হিসাবে জম্বু তথা 'ডোগড়া' ও দক্ষিণশ্রেণী হিসাবে গাড়োয়াল জেলা পর্যন্ত বিস্তৃত 'কাঙড়া' এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন। শেষের দিকে রাজস্থানী শিল্পের কতকাংশে মোগল-প্রভাবও যে পড়েনি তা নয়। কাঙড়া শিল্পশ্রেণীর মধ্যে অবশ্য কোট-কাঙড়া শিল্পের মাধ্যর্যই ছিল শ্রেষ্ঠ। চীন পরিব্রাজক হিউয়েন-সাঙ খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে প্রাচীন জলন্ধর-বংশকে অবিভক্ত বলে বর্ণনা করেছেন, অর্থাৎ তখনও জলন্ধর-বংশের রাজারা একত্রিত হয়ে বসবাস করছিলেন। তাঁরা হিন্দু ছিলেন। পরে ক্রমশঃ নগরকোট বর্তমান কোট-কাঙড়ার পার্বত্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। কাঙড়ার রাজপুতরা খৃষ্টীয় ১৮শ ১৯শ শতাব্দী মুসলমান আক্রমণকে প্রতিরোধ করে রেখেছিল ('until 1806')। খৃষ্টীয় ১৭৭৪—১৭৮৫ এবং ১৮০৬—১৮৪৬ পর্যন্ত শিখদের অধিকারে ছিল কাঙড়া অঞ্চল। শেষের দিকে কাঙড়ার চিত্রশিল্পে তাই রাজপুত ও শিখদের সংমিশ্রিত প্রভাব চোখে পড়ে। রাজপুত ও পাহাড়ী চিত্রশিল্পে বৈষ্ণব ও ভক্ত কবিদের প্রভাবও দেখা যায়। ভক্ত-কবি জয়দেবের (১২শ শতাব্দী) গীতগোবিন্দের প্রতিফলনও রাজপুত ও পাহাড়ী (জম্বু ও কাঙড়া) চিত্রশিল্পে পাওয়া যায়। কাঙড়া শিখদের অধিকারে এলে শিখ-পরিবেশ নিয়ে পাহাড়ী-শিল্পে কিছুটা পরিবর্তন চোখে পড়ে। শ্রদ্ধেয় পার্সি-ব্রাউন বলেন খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দীতে বিশেষভাবে সংসাদচাঁদের সময়েই কাঙড়া-চিত্রকলার চরম উৎকর্ষ সাধন হয়েছিল।

সম্রাট অকবরের রাজত্বকালে রাগ-রাগিণীদের চিত্রসম্ভার তথা রাগমালা-চিত্র নতুন

1. vide (a) A. Coomaraswami: *Rajput Paintings* (1916) Vol. I; (b) Motichandra' *Indian Paintings in the Punjab Hills*—Vide. Marg, Vol. VI, No. I.

পরিবেশ নিয়ে সৃষ্টি হল। 'Intermingling of Mogul and Rajput Art' নিবন্ধে শিল্প-সমালোচক বেসিল গ্রে বলেছেন : He (Akbar) was the real creator of the school of Mogul painting as of the Mogul Empire'. প্রকৃতপক্ষে ঐ সময়ে রাজস্থানী চিত্রশিল্পেও (রাগমালা-চিত্রেও) কিছুটা প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। কেননা অনেকে রাজপুত সামন্ত রাজারা সম্রাট আকবরের দরবারে ও রাজত্বের বিভিন্ন বিভাগে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন। তাঁরা স্বভাবতই তাঁদের শাসন এলাকায় ভারতের সাহিত্য, কাব্য ও ললিতকলার উন্নতি সাধনে চেষ্টা করেছিলেন, আর তারই জন্য তদানীন্তন সাহিত্যিক, কবি, চিত্রশিল্পী ও সঙ্গীতজ্ঞেরা তাঁদের বিদ্যা ও শিল্প-আলোচনায় মোগলদরবারের সহায়তা পেয়েছিলেন। ফলে সাহিত্যিক, কবি ও শিল্পীরাই একদিক দিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক মিলনের সেতু বা যোগসূত্র-স্বরূপ ছিলেন।

অধ্যাপক অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় তাঁর *Rajput Portrait* (of the Indigenous School) নিবন্ধে 2 মোগল, রাজস্থান প্রভৃতি প্রতিকৃতির তুলনামূলক আলোচনায় রাজস্থানী প্রতিকৃতির অঙ্কনশৈলী সম্বন্ধে বলেছেন যে রাজস্থানী অঙ্কনশৈলীর জন্ম হয়েছিল খৃষ্টীয় ১২শ থেকে ১৫শ শতাব্দীর সমাজে ও পরিবর্ধিত ও পরিপুষ্ট গুজরাটি অঙ্কনপ্রণালী থেকে ("The pure Rajasthani portrait-style is, again linked to and from the Gujerati paintings of the 12th, 13th, 14th and 15th centuries")[3] প্রকৃতপক্ষে রাগমালা চিত্রাঙ্কন-শৈলীর ক্রম পরিণতির মধ্যেও গুজরাটী-অঙ্কন শৈলী থেকে বিকাশ লাভ করেছে। ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী কাঙড়া-চিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যেমন বলেছেন : "and in them also is realized the Kangra ideal of feminine loveliness, willowy, fair, serene, and passionate—a type still to be found in Kangra * * * * * * * তেমনি অধ্যাপক শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গংগোপাধ্যায় রাজস্থানের হিন্দু ও পাহাড়ী শ্রেণীর প্রতিকৃতি চিত্রের বৈশিষ্ট সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেন দেখা যায় The indigenous style of porpait painting developed in Rajasthan with its peculiar technique of flat, shadow-less locus, rendered in strong decisive outlines, was carried to the Hill States of Punjab and adhered to, in spite of occasional penertration of Moghul influence", শিল্প-সমালোচক এইচ্ গোয়েজও রাজপুত ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁর 'রাজপুত স্কাল্প্চার এ্যান্ড পেন্টিং আণ্ডার রাজা উমদ্ সিং অব্ চাম্বা' নিবন্ধে (ভাইড্ মার্গ, ভ্যলুম সেভেন সেপ্টেম্বর ১৯৫৪) অভিমত প্রকাশ করেছেন। মোটকথা খৃষ্টীয় ১৩শ-১৪শ থেকে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে রাজপুত, জম্বু, কাঙড়া, মোগল প্রভৃতি চিত্রাবদানই রাগ-রাগিণীদের চাক্ষুষমূর্তিকে সার্থক করে তুলেছে। সাধক শিল্পীদের ধ্যানঘন-প্রেরণা ও কল্পনাই রাগমালা-চিত্রকে করেছে বিচিত্র রস, ভাব ও রঙে রঞ্জিত,— চিত্রের লাবণ্য, কমনীয়তা ও সৌন্দর্যের করেছে প্রাণদান।

খৃষ্টীয় ১৮শ অব্দের বাঙলার মুর্শিদাবাদ চিত্রকলাও সংগীতের রাগমালা-প্রতিকৃতির

2. The Rajput rajas had a special position in the Mogul Empire. * * The rajas of the Rajput States now had the vernacular renaissance by supporting the poet, musicians and painters, while at the same time, through them, the Hindu and the Mogul made contact".

3. Vide *Marg*, Vol. VII, Sept. 1954, No. 4, pp. 12—34.

জগতে কিছু অবিস্মরণীয় দান কিছু রেখে গেছে সে কথা রবার্ট স্কেলটন তাঁর 'মুরশিদাবাদ-পেন্টিং' নিবন্ধে উল্লেখ করেছেন। মুর্শিদাবাদের নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার চরিত্র ঐতিহাসিকরা নির্মমতার প্রলেপ দিয়ে বর্ণনা করলেও তাঁর ললিতকলার ওপর একান্ত অনুরাগ ও প্রীতি সংগীত ও চিত্রকলার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল। মিসেস ডি'-আর্সি হার্টের সংগৃহীত মুর্শিদাবাদ চিত্রাবলীর মধ্যে হিন্দোল (১৭৫৫ খৃঃ) ও ককুভ (১৭৫৫খৃঃ) বোড্লিন লাইব্রেরীর সংগৃহীত শ্যাম-গুঞ্জরী (১৭৫৫ খৃঃ) এবং ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরী সংগৃহীত শিব-পূজারতা ভৈরবী রাগরূলির চিত্র নাকি নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার রাজত্ব সময়ে আঁকা হয়েছিল। রবার্ট স্কেল্টন উল্লেখ করেছেন "The paintings of this series demonstrate clearly that during the short period of Siraj-ud-daula's influence and rule the Murshidabad style gained a new freedom and freshness of vision * *" তবে একথা ঠিক যে, মুর্শিদাবাদ চিত্রাংকনশৈলী রাজপুত ও মোগল শৈলী দুটির মিশ্রণে ও কিছুটা বাঙলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। রাগ-রাগিণীদের চাক্ষুষ চিত্রের উদ্দেশ্য ভাবসমাহিত শিল্পীর রঙ্-রেখা ও সুর সাধনায় দেয় জাগরণ ও পুলক, করে চেতনাদীপ্ত এবং পার্থিব মিশনের সংগে সংগে অপার্থিব মহামিলনের দেয় প্রত্যক্ষ পরিচয়। সংগীতে ধ্যান ও দেবতামন্ত্র ধ্যানরূপের তাই উপযোগিতা থাকবে চিরদিনই। শ্রীকণ্ঠ তাঁর 'রসকৌমুদী' গ্রন্থে ধ্যানের মাধুর্য বর্ণনা করতে গিয়ে তাই বলেছেন,

ধ্যানং বিনা রাগ সমূহমেতং
গায়ন্তি রাগেঽনিপুনা জনা মে।
সংগীতশাস্ত্রোক্ত ফলানি রাগাঃ
তেভ্যঃ প্রথঘ্নন্তি কদাপি নৈব ।।

ভারতীয়-দর্শনে যুক্তিবিচারের স্থান

রমা চৌধুরী

সকলেই জানেন যে, বেদই ভারতীয় দর্শনের মূল ভিত্তি। পরবর্তী সকল ভারতীয় দার্শনিক মতবাদই বেদের প্রামাণ্য স্বীকার বা অস্বীকার করে নিয়ে বেদের দ্বারা প্রভূত ভাবে প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এই রীতি অনুসারে ভারতীয় দার্শনিক মতবাদ-সমূহকে "আস্তিক" বা বেদে বিশ্বাসী ও "নাস্তিক" বা বেদে অবিশ্বাসী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। সাংখ্য—যোগ, ন্যায়—বৈশেষিক, মীমাংসা—বেদান্ত — এই হল আস্তিক ষড়্ দর্শন। চার্বাক জৈন ও বৌদ্ধমত — এই হল নাস্তিক তিনটী দর্শন। পুনরায়, আস্তিক দর্শনের মধ্যে, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনই বিশেষ ও সাক্ষাৎ ভাবে যথাক্রমে বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ভিত্তিতে গঠিত।

কিন্তু এই ভাবে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করার জন্য কোনো কোনো পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত ভারতীয় দর্শনকে "Dogmatic" বা যুক্তি বিচারশূন্য এই আখ্যা দিয়েছে। তাঁদের মতে, ভারতীয় দার্শনিকগণ নিজেদের স্বতন্ত্র বিদ্যা বুদ্ধি ও যুক্তি বিচার দিয়ে কোনো দার্শনিক মতবাদ প্রপঞ্চনা করতে পারেন না— তাঁরা কেবলই পরের কথায় নির্ভর করে পরের মতবাদেরই পুনরাবৃত্তি করেন। শাস্ত্রবাক্যে এরূপ অন্ধবিশ্বাসই হল "Dogmatism" বা পরমুখাপেক্ষিতা। সেজন্য এই মতানুসারে, ভারতীয় দর্শনে যুক্তিবিচারের কোনোরূপ স্থানই নেই।

বলাই বাহুল্য যে, এই শাস্ত্রে অন্ধ বিশ্বাস ও পরমুখাপেক্ষিতার অভিযোগ নাস্তিক দর্শনের বিরুদ্ধে উত্থাপিত করা চলেনা। আস্তিক দর্শনের মধ্যেও প্রথম চারটী, অথবা, সাংখ্য—যোগ, ন্যায়—বৈশেষিক মতবাদ সাধারণভাবে বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করে নিলেও, সাক্ষাৎ ভাবে বৈদিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। একমাত্র শেষ দুটী আস্তিক দর্শন, অর্থাৎ, মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনই সাক্ষাৎ ভাবে বেদের ভিত্তিতে গঠিত বলে, এ' কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয় যে, এই দুটী মতবাদ যুক্তি বিচারমূলক একেবারেই নয়। কিন্তু এরূপ ধারণাও একেবারেই ভিত্তিহীন। বিশেষ করে, যে বেদান্ত দর্শন ভারতীয় দর্শনের প্রাণস্বরূপ এবং জগতের দর্শনশাস্ত্রের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ দর্শন, সেই বেদান্ত দর্শনে যে যুক্তি বিচার এবং স্বাধীন চিন্তা ও সিদ্ধান্তের কোনোই স্থান নেই — এই মতবাদ সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক।

বস্তুতঃ বেদান্তের ব্রহ্মবাদ সুদৃঢ় যুক্তির ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। শাস্ত্র থেকে বহু বাক্য বেদান্ত-ভাষ্যাদি প্রমুখ গ্রন্থে উদ্ধৃত করা হয়েছে, সত্য। কিন্তু বেদান্তে বিভিন্ন মতবাদ কেবল এই শাস্ত্রবাক্যের মাধ্যমেই প্রমাণিত করার কোনো প্রচেষ্টা বেদান্ত দর্শনে নেই। উপরন্তু, প্রথমে যুক্তির সাহায্যে একটী বিশেষ তত্ত্ব স্থাপিত করে, পরে শাস্ত্রবাক্য দ্বারা তা' দৃঢ়ীকৃত করা হয়েছে, মাত্র। সেইজন্যই অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রপঞ্চক বিশ্ববিশ্রুত আচার্য শঙ্কর জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়িকরূপে সম্মানিত হয়েছেন। পরবর্তী অদ্বৈতবাদিগণের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণক্ষমতা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারনৈপুণ্য ন্যায়শাস্ত্রের শ্রেষ্ঠ উদাহরণরূপে বিরাজ করছে। শঙ্করের প্রধানতম ও প্রখ্যাততম প্রতিদ্বন্দ্বী বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠ প্রপঞ্চক আচার্য রামানুজ তাঁর সুপ্রসিদ্ধ বেদান্ত-ভাষ্য "শ্রী ভাষ্যে" যে ভাবে অদ্বৈত-

বাদ-খণ্ডনে প্রয়াসী হয়েছেন, তাও তর্ককুশলতার বিশিষ্ট দৃষ্টান্ত। একইভাবে সকল বেদান্ত সম্প্রদায়েই স্বপক্ষ প্রবর্তন ও পরপক্ষখণ্ডন অতি নিপুণভাবে, অতি নিগূঢ় তর্ক বিচারের সাহায্যেই করা হয়েছে। ব্রহ্ম-সূত্রে ব্রহ্মকারণবাদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সাতটী আপত্তি উত্থাপিত করা হয়েছে, এবং সকল বেদান্ত সম্প্রদায়ই অতি যত্নের সঙ্গে এই আপত্তি যুক্তিবিচার দ্বারা খণ্ডন করেছেন। এমন কি, একেশ্বরবাদী বেদান্ত সম্প্রদায়সমূহের মতই একতত্ত্ববাদী শঙ্করও ব্যবহারিক দিক থেকে এই খণ্ডন-প্রণালী স্বীকার করে নিয়েছেন। এ ছাড়া, ব্রহ্মসূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের "তর্কপাদ" নামক দ্বিতীয় পাদে বৈদান্তিকদের তর্কজ্ঞান ও বিচার কুশলতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এই পাদটী আদ্যোপান্ত সাংখ্য—যোগ, ন্যায়—বৈশেষিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রমুখ বিভিন্ন দার্শনিক মতবাদের যুক্তি বিচারমূলক খণ্ডনে পরিপূর্ণ।

সেজন্য, বেদান্ত দর্শনে, ব্রহ্মকে "শাস্ত্রযোনি" বা শাস্ত্রগম্যরূপে (ব্রহ্মসূত্র ১-১-৩) গ্রহণ করা হয়েছে বলেই যে স্বাধীন চিন্তা ও বিচারশক্তির কোনো রূপ স্থানই নেই — এই ধারণা যে কতদূর ভুল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যে কোনো বেদান্ত মতবাদের যে কোনো গ্রন্থের সামান্য মাত্র অংশও পাঠ করলে। নিগূঢ়তম পরমতত্ত্বকে বুদ্ধির পরিমাপে আয়ত্ত করার এরূপ নির্ভীক, স্থির ও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা জগতে সত্যই অতুলনীয়। সাধারণ মানব-বুদ্ধির দীনতা ও সঙ্কীর্ণতা স্বীকার করেও ভারতের দার্শনিকগণ কোনো ক্ষেত্রেই শ্রুতিবাক্যে অন্ধবিশ্বাসকে জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়রূপে গ্রহণ করেননি। উপরন্তু, সুবিখ্যাত সাধন-ত্রয়ঃ শ্রবন, মনন ও নিদিধ্যাসনের মধ্যে "শ্রবণ" বা শাস্ত্র ও গুরুবাক্য প্রাথমিক ও সাময়িক ভাবে গ্রহণ সাধন-মার্গের প্রথম সোপানই মাত্র। "মনন" বা স্বাধীন চিন্তার সাহায্যে সেই গৃহীত তত্ত্বের পরীক্ষা, এবং "নিদিধ্যাসন" বা মননের পরে তার চরম ভাবে গ্রহণ ও সাক্ষাৎ উপলব্ধি ত ভারতীয় সাধনার মূল কথা। সেজন্য, প্রারম্ভে যিনি "শাস্ত্র-যোনি," পরিসমাপ্তিতে তিনিই প্রত্যক্ষ অনুভূতি বা উপলব্ধিগম্য — এই হল ভারতীয় দর্শনের শাশ্বত আশার বাণী। জাগতিক "বুদ্ধি" থেকে পারমার্থিক "বোধিতে" ও লৌকিক "প্রত্যক্ষ" থেকে অলৌকিক "উপলব্ধিতে" — সাধারণ "জ্ঞান" থেকে অসাধারণ "প্রজ্ঞায়" উন্নীত হওয়াই ত জ্ঞানস্বরূপ জীবের জীবন-লক্ষ্য। কিন্তু এই দুরূহ কার্যের জন্য প্রয়োজন হয় কয়েকটী প্রাথমিক সম্বল বা ভিত্তির যা আমরা পাই সদ্‌গুরু ও সত্য দ্রষ্টৃগণের বাণী বা শ্রুতি-বাক্যের মাধ্যমে। অবশ্য তার পরের ব্যাপার সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদেরই তখন আর কোনো সহায়ক বা অন্তবর্তীর প্রয়োজন আমাদের থাকেনা। "শ্রবণ" ও "মনন" দুটীই কেবলমাত্র অপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের স্তর। প্রথম ক্ষেত্রে, আমরা অপরের মাধ্যমে পরোক্ষ ভাবেই মাত্র জ্ঞানলাভ করি। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও, আমরা নিজেদেরই মনে চিন্তান্বিত ও সন্দেহাকুল হয়ে স্থির ও সাক্ষাৎ জ্ঞানলাভে হই অসমর্থ। কিন্তু "নিদিধ্যাসনই" হল জ্ঞানমার্গের চরমোৎকর্ষ ও পরম-লক্ষ্য, যখন আমরা সমস্ত সন্দেহাতীত পরম-তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করি প্রত্যক্ষ ভাবে। অবশ্য এরূপ "নিদিধ্যাসন" সম্ভবপর হয় "শ্রবণ" ও "মননেই" ক্রম-মাধ্যমে সেজন্য, সাধারণ যুক্তি-বিচারের দ্বারা সন্দেহ ও অবিশ্বাসের জটাজাল অপসৃত হলেই ক্রমশঃ উদয় হতে পারে স্থির প্রজ্ঞার দীপ্ত জ্যোতির্ময়ের।

এই কারণে, ভারতীয়-দর্শনে যুক্তিবিচারের স্থান এরূপ উচ্চে। এবং "পূর্বপক্ষ" "খণ্ডন" ও "উত্তরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত" — এই তিনটীই ভারতীয় দর্শন-প্রণালী। "পূর্বপক্ষ" হল প্রামাণ্য মতবাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত সম্ভাব্য আপত্তি— যা প্রথমেই নিরাকরণ না করলে মনের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূর হতে পারে না। সেজন্য, প্রত্যেক ভারতীয় দার্শনিকের পক্ষে এরূপ "পূর্বপক্ষ-খণ্ডন" অবশ্য প্রয়োজন এবং অনিবার্য্য — এই "পূর্বপক্ষ-খণ্ডনের" মাধ্যমে

"উত্তর-পক্ষ বা সিদ্ধান্ত স্থাপন" সম্ভব। এই কারণেই, আপাতদৃষ্টিতে শাস্ত্রে অন্ধভক্তিশীল ভারতীয় দার্শনিকগণও এরূপে যুক্তিতর্কের সাহায্যে সকল সন্দেহ নিরসনের জন্য সর্বদাই উদ্গ্রীব; এবং সেইজন্যই ভারতীয়-দর্শন জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিচারমূলক দর্শনরূপে গৃহীত হয়েছে। ভারতীয়-দর্শনে আপাতদৃষ্টিতে বহু পরস্পর-বিরুদ্ধ তত্ত্বের সমাবেশ দেখা যায়। কিন্তু যে সংস্কৃতির মূল সমন্বয়, বর্জন নয়, যে সংস্কৃতি বহু আপাত-অসমঞ্জস কৃষ্টিধারার পুণ্য সঙ্গমই মাত্র, সেই সংস্কৃতিরই ধারক ও বাহকগণ অসামঞ্জস্য ও বিরোধের মধ্যেও মিলনের মূল-সূত্রটী সর্বদাই আবিষ্কার করেছেন। একই ভাবে, যাকে পাশ্চাত্ত্য-দর্শনে বলা হয় "Reason" and Revelation" সেই "যুক্তি ও শ্রুতি" আপাতদৃষ্টিতে পরস্পরবিরোধী বলে মনে হলেও, ভারতীয় দর্শনে উভয়কেই সমান গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, এবং পরস্পরের পরিপূরক বলেই গ্রহণ করা হয়েছে।

বেদান্ত দর্শনে "শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনের" এই অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধের নির্দেশ করে, শঙ্কর বলছেন —

"নানেন মিষেণ শুষ্ক তর্কস্যাত্মা-লাভঃ সম্ভবতি।
শ্রুতানুগৃহীত এব হ্যয় তর্কোঽ নুভবাঙ্গত্বেনাশ্রীয়তে।"
(ব্রহ্ম-সূত্রে শঙ্কর-ভাষ্য ২'১-৬)।

অর্থাৎ, শুষ্ক-তর্ক বা কেবল স্বতন্ত্র তর্ক নিরর্থক। যে তর্ক শ্রুতির অনুসারী এবং অনুভব বা সাক্ষাৎ উপলব্ধির উপায়স্বরূপ, সেই তর্কই গ্রহণীয়।

এস্থলে তর্ককে "শ্রুতানুগৃহীত" বলাতে হয়ত মনে হতে পারে যে, এরূপ তর্কের একমাত্র কার্য কেবল শ্রুতিবাক্যকেই সমর্থন করা, তা' পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বর্জন করার কোনরূপ স্বাধীনতা এস্থলে তর্কের নেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বেদের যখন বহু বিভিন্ন ব্যাখ্যা আছে, তখন বেদবাক্য-বিষয়ে স্বাধীন চিন্তা ও মতভেদের কোনো অবকাশ নেই, তা' বলা চলে কি করে? এক বেদান্ত-দর্শনেই দশটী বিখ্যাত সম্প্রদায় আছে; এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ই দাবী করেন যে, তাঁদের মতবাদ সাক্ষাৎ ভাবে বেদ-বেদান্তের ভিত্তিতেই সুপ্রতিষ্ঠিত। সেজন্য, প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বতন্ত্র যুক্তি বিচারের সাহায্যে বেদের একটী বিশেষ ব্যাখ্যা স্থির করে, সেই ব্যাখ্যানুসারে নিজস্ব দার্শনিক সম্প্রদায় গঠন করেন। এরূপে, "শ্রুতানুগৃহীত-তর্ক" বা "মননের" দুটী প্রধান কার্য :—(১) "শ্রবণের" অব্যবহিত পরেই শ্রুতির একটী স্বচিন্তানুসারী অর্থ স্থির করা; (২) পরে সেই অর্থ বা তত্ত্বকে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে স্থাপিত এবং পরমত খণ্ডন করা। এই ভাবে "শ্রুতানুগৃহীত-তর্কের" অর্থ এই যে, তর্কেরও একটী প্রারম্ভিক ভিত্তি চাই— সাধারণ তর্কের ক্ষেত্রেও তাই চাই, অর্থাৎ, যাকে বলা হয় "Premise"। এক্ষেত্রে, বেদ সেই "Premise" ব্যতীত আর কিছুই নয়। ভারতীয় শাস্ত্রমতে, বেদ "অপৌরুষেয়" অর্থাৎ, সর্বজ্ঞানিধি বেদ সাধারণ অল্পজ্ঞ মানবের সৃষ্টি নয়। বেদ ভাগবতী বাণী অথবা, জ্ঞানস্বরূপ পরমেশ্বরের বার্তাবহ সত্যদ্রষ্টা ঋষিবৃন্দের শ্রীমুখনিঃসৃত অমৃতময় উপদেশ। আমরা যারা সাধারণ অজ্ঞ মানব, তারা প্রথমতঃ এই সকল অসাধারণ প্রজ্ঞাসম্পন্ন মণীষিগণের উপদেশ অনুসারেই অলৌকিক তত্ত্বাদি বিষয়ে কিছু ধারণা করতে পারি — আমাদের নিজেদের সে শক্তি বা বুদ্ধি কোথায় যে প্রথম থেকেই বিনা সাহায্যে এরূপ নিগূঢ় বিষয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারব? সাধারণ জীবনেও শিক্ষার ক্ষেত্রেও, আমাদের প্রথমে বহুদিন পিতা, মাতা, শিক্ষক প্রভৃতির উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে তে সেরূপ প্রাথমিক সাহায্য আমাদের পক্ষে সহস্রগুণ অধিক প্রয়োজন। এই কারণেই, শাস্ত্র ও গুরুবাক্যে শ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক সাধনার প্রথম সোপান বলে' ভার-

তীয় দর্শনে স্বীকৃত হয়েছে। ব্রহ্মের "শাস্ত্র-যোনিত্ব" ও ভারতের "গুরুবাদের" এইটাই হল মর্মোত্থ-বাণী। অজ্ঞ মানব বুদ্ধির অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মনে করে যে, সাধারণ প্রত্যক্ষ অনুমানাদির সাহায্যেই অনায়াসে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সম্ভবপর। বিশেষ ভাবে, এরূপ মূঢ় ব্যক্তিদের শিক্ষার্থেই বেদান্তে ব্রহ্মকে "শাস্ত্রযোনি" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। উপনিষদের সাবধান-বাণীও এই উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত করা হয়েছে ঃ —

"যতো বাচো নির্বর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।"
(তৈত্তিরীয় ২-৪)

"যস্যামতং তস্য মতং মনং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ।।"
(কেন — ২-৩)।

অর্থাৎ, তিনিই ব্রহ্ম, মন যাঁকে ধারণা করতে পারেনা, বাক্য যাঁকে প্রকাশ করতে পারেনা।

যিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মকে জানতে পারেননি, তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানেন। কিন্তু যিনি মনে করেন যে, ব্রহ্মকে জানতে পেরেছেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে তাঁকে জানেন না।

ব্রহ্মজ্ঞান, দার্শনিক-তত্ত্ব-জ্ঞান যে সাধারণ জ্ঞান নয়, জ্ঞানেরও যে স্তরভেদ আছে, এবং জ্ঞানের প্রকার-ভেদানুসারে তার প্রমাণ-ভেদও যে অবশ্যম্ভাবী — এই হল বেদান্ত-দর্শন তথা ভারতীয় দর্শনের, অভিমত। কিন্তু যুক্তিবিচারের প্রয়োজন সর্বত্রই সানন্দে স্বীকৃত হয়েছে।

"যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্মহানিঃ প্রজায়তে"।

পরবর্তী স্মৃতিকারদের এই বিধানই ভারতীয় দর্শনের মূল কথা। তার প্রকৃষ্টতম প্রমাণ হল এই যে — জগতের বহু ধর্মে "Last Prophet" এর কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে বলা হয়েছে। অর্থাৎ, এই মতানুসারে, একজন বিশেষ "Prophet" বা ধর্মপ্রবর্তকের বাণীই ভগবানের চরম ও পরম বাণী, তারপরে ভাগবতী বাণীরূপ শাস্ত্রের আর কোনোরূপ ব্যাখ্যা হতে পারেনা এবং সেজন্য কোনোরূপ নূতন চিন্তা ও যুক্তিবিচারের স্থানই এক্ষেত্রে নেই। কিন্তু ভারতীয় ধর্ম ও দর্শনে এরূপ "Last Prophet" তত্ত্ব কোনোদিনও স্বীকৃত হয়নি। ভারতীয় মতে, সত্য যেমন অনন্ত, সত্যদ্রষ্টা ঋষিরাও ঠিক তেমনি অনন্ত। সেজন্য অনন্তকাল ধরেই সকলেই শাস্ত্রবাক্যের স্ব স্ব বিচার বুদ্ধি অনুসারে বিভিন্ন ব্যাখ্যা রচনা করে অনন্ত ধর্ম-মত ও দার্শনিক-সম্প্রদায়ের প্রবর্তনা করতে পারেন — "এইটাই জগতের শেষ ধর্ম-মত এইটাই জগতের শেষ দার্শনিক সম্প্রদায়, ইনিই জগতের শেষ ও একমাত্র ধর্ম ও দর্শন প্রবর্তক"—এরূপ অনন্ত দাবী করার স্পর্ধা যেন কারো না থাকে — এই হল ভারতীয় দর্শনের বিধান। এই কারণ নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, ভারতীয় দর্শন যেরূপ যুক্তিবিচারের অনন্ত মহিমায় উদ্ভাসিত, জগতের কোনো দর্শনশাস্ত্রই সেরূপ নয়।

ইবসেন

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

শেক্সপীয়ারের পরে কোন নাট্যকারের নাম করা যেতে পারে? ইতালিয়ান নোবেল লরিয়েট লুইগি পিরান্দেল্লো দৃঢ়প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন, শেক্সপীয়ারের পরে ইবসেনের স্থান। একথা যুক্তি-সঙ্গত। ইবসেন আধুনিক নাটকের জন্মদাতা। তিনিই প্রথম বাস্তব জীবনের সহিত নাটকের যোগাযোগ স্থাপন করেছেন। এই যোগাযোগ না ঘটলে বর্তমান শতকে যুগোপযোগী নাটক পাওয়া যেত না। পরবর্তী নাট্যকারদের প্রায় প্রত্যেকেই ইবসেনের রচনার দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছেন। বার্ণার্ড শ'র উপর ইবসেনের প্রভাব যে কত বেশী তা তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রথম ভাগের রচনা 'দি কুইনটেসেন্স অব ইবসেনিজম (১৮৯৮)' থেকেই জানা যায়। শুধু নাটকে নয়; সাহিত্যের অন্যান্য শাখার উপরেও ইবসেনের প্রভাব পড়েছে। জেমস্ জয়েস্-এর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফিন্নেগান্স্ ওয়েক' পড়তে গিয়ে অনেক জায়গায় ইবসেনের কথা মনে পড়ে।

১৮২৮ সালের ২০শে মার্চ হেনরিক ইবসেন নরওয়ের ছোট শহর স্কিয়েনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ঋদ্দ ইবসেন ছিলেন অবস্থাপন্ন ব্যবসায়ী, তাঁর সর্বদাই ঝোঁক ছিল অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর অর্থ উপার্জন করবার। এই উদ্দেশ্যে তিনি শেয়ার বাজারে এবং ব্যবসায়ে দুঃসাহসিক ঝুঁকি গ্রহণ করতেন। একবার এর ফল বড় মারাত্মক হল। ঋদ্দ হামসুনের সঞ্চিত অর্থ ও ব্যবসা ডুবে গেল। ইবসেনের বয়স তখন আট। হঠাৎ পরিবারের এই ভাগ্য-বিপর্যয় তাঁকে গভীর আঘাত দিয়েছিল। সচ্ছলতার পরে দারিদ্রের অভিজ্ঞতা বড় কঠোর মনে হয়েছিল তাঁর কাছে। এর জন্য বালক বয়সেই কোন্ এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তাঁর মন বিষিয়ে উঠেছিল।

কঠোর দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করলেও ইবসেনের শিল্পীসত্তার বিকাশ শুরু হয়েছিল ছেলে-বেলা থেকেই। ইবসেন তখন স্কুলের ছাত্র; তেরো-চৌদ্দ বছরের কিশোর। শিক্ষক যা যে বিষয়ে খুশি রচনা লিখতে দিলেন। ইবসেন লিখলেন স্বপ্ন সম্বন্ধে একটি রচনা। ক্লাশে সেটি যখন তিনি পড়লেন তখন সবাই চুপ করে শুনল। একজন স্কুলের ছাত্র এত ভালো রচনা লিখতে পারে তাঁর বিশ্বাস হয় না। তিনি ভাবলেন, অন্য কেউ ইবসেনকে লিখে দিয়েছে।

ছেলেবেলায় ইবসেনের ভবিষ্যতে লেখক হবার কথা কখনো মনে হয়নি। তিনি বেশ ভালো ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর স্বপ্ন ছিল রোমে গিয়ে চিত্রশিল্প শিখবেন। কিন্তু স্কুলের সাধারণ শিক্ষার পর ইবসেনের পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ছেলের উচ্চতর শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করবার সামর্থ্য পিতার ছিল না।

শুধু যে পড়া বন্ধ হয়ে গেল তাই নয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে ইবসেনকে অবিলম্বে উপার্জনের পথ খুঁজে নিতে হল। গ্রিমস্টাড শহরে এক ওষুধের দোকানে শিক্ষানবিস হিসাবে তিনি যোগ দিলেন। দীর্ঘ সাত বছর তাঁকে এই দোকানে থাকতে হয়েছে। দিনের বেলা ক্ষুদ্র বন্ধ দোকান ঘরে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। রাত্রিটা কাটাতেন বই পড়ে, যতক্ষণ ক্লান্তিতে চোখ বুঁজে না আসত। অবশ্য ক্লান্ত হয়ে পড়তেন সহজেই। মনিব দু'বেলা খেতে ও সামান্য হাত-খরচা দেবে, এই ছিল শিক্ষানবিসীর শর্ত। শত'টা প্রায়ই ভঙ্গ হত খাবারের বেলায়। প্রায় পেট ভরে খেতে পেতেন না। ইবসেনের তখন প্রথম যৌবন; খুব লম্বা-চওড়া চেহারা। উপযুক্ত

খাদ্যের অভাবে বড় কষ্ট হত। ক্ষুধার তাড়না যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে ইবসেন নানা বিষয়ের বই পড়তেন। এইসময়কার বই পড়বার অভ্যাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে।

ইবসেন গ্রিমস্টাডে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। সামাজিক হবার জন্য যে সব চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন ইবসেনের তা ছিল না। তার উপর কঠোর জীবনযাত্রা তাঁর তরুণ হৃদয় হতাশায় পূর্ণ করেছিল। উনিশ বছর বয়সে তিনি 'হতাশা' নামে একটি কবিতা লিখলেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এই কবিতায় বলছেন : "নাম-গোত্রহীন জনতার স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে; তাদের একজন হয়ে আমি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব।" ইবসেনের প্রথম কবিতা "শরৎ কালে" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় "ক্রিশ্চিয়ানিয়া পোস্ট" কাগজে।

একদিন বোন হেদভিগ-এর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ইবসেন বললেন, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা লাভ করতে চাই।

বোন জিজ্ঞাসা করল, লাভ করবার পরে কি করবে?

—তারপর হারিয়ে যাব,— "upwards, toward the peaks. Toward the stars. And toward the great silence."

মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন। বন্ধু শুলেরাদ বারবার লিখছে ক্রিশ্চিয়ানিয়া (বর্তমান অস্‌লো) এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। ইবসেনেরও তা বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অর্থাভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু একদিন সকল বাধা অগ্রাহ্য করে ক্রিশ্চিয়ানিয়া চলে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভর্তি হলেন স্কুলে। এখানে তাঁর আলাপ হল এমন অনেকের সঙ্গে যাঁরা পরবর্তী জীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরওয়ের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার বিয়রন্‌সন। পরবর্তী জীবনে ইবসেনের সঙ্গে তাঁর নানা কারণে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভালো হল না। গণিত ও গ্রীক পরীক্ষায় খুব কম নম্বর পেলেন। শিক্ষকরা তাঁকে আর একবার পরীক্ষা দেবার জন্য উৎসাহিত করলেও তাঁর পড়বার আর আগ্রহ ছিল না।

ক্রিশ্চিয়ানিয়া শহরে এসে ইবসেনের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হল না। কিন্তু ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে নরওয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে এসে তাঁর লাভ হল প্রচুর। তাঁর মনের দিগন্ত অনেক দূর প্রসারিত হল। ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব ইবসেনের মানসিক গঠন রূপান্তরিত করেছে। তিনি শ্রমিক সমস্যা, সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশা এবং সামাজিক অত্যাচার সম্বন্ধে ভাবতে শিখলেন।

১৩১৭ সালে ডেনমার্ক নরওয়ে জয় করে। প্রায় চারশ' বছর পরে, ১৮১৪ সালে নরওয়ে স্বাধীনতা ফিরে পায়। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে ডেনমার্কের সংস্কৃতি নরওয়ের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাজধানীতে এসে ইবসেন উপলব্ধি করলেন যে, দেশপ্রেমিক তরুণরা নরওয়ের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায় দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার দূর হবার পরও দীর্ঘকাল যাবৎ সাংস্কৃতিক প্রভাবটা থেকে যায়।

ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার উদ্দীপনা এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ইবসেন

কিছুদিন ভবিষ্যৎ জীবনের পথ স্থির করতে পারেননি। কিছুকালের জন্য রাজনীতির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পী মন রাজনীতিবিমুখ হল অল্প দিনের মধ্যেই। তিনি স্থির করলেন নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবেন।

এই সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইবসেন রচনা করলেন তাঁর প্রথম নাটক "ক্যাটিলিন" (১৮৫০)। এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে ইবসেন পরিচিত হয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার সময়। পদ্যে রচিত এই ট্র্যাজেডিতে সিসারোর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সত্ত্বেও পাঠকের সহানুভূতি বিদ্রোহী নায়ক ক্যাটিলিনের উপরেই পড়বে। ইবসেনের সে সময়কার মানসিক অবস্থার ছাপ পড়েছে এই নাটকে।

নাটক লেখা হল;কিন্তু কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করতে রাজী হল না। প্রকাশকরা জানাল প্রকাশনের সকল ব্যয়ভার বহন করলে তারা এই নাটক ছাপাতে পারে। বন্ধুর প্রতিভার উপর শুলেরাডের অগাধ বিশ্বাস। সে ঋণ করে আড়াই শ' কপি 'ক্যাটিলিন' ছাপাল। নাটকের কঠোর সমালোচনা বের হল কাগজে। বিক্রি হল না। ঋণের দুশ্চিন্তা তো আছেই; তার উপর দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করবার মতো সামর্থ্য দু' বন্ধুর কারোই ছিল না। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় দু'শ' কপি বই পুরনো কাগজের দরে বিক্রি করে খাবার কিনে আনল।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ বছরই "ভাইকিঙের কবর" একটি থিয়েটার গ্রহণ করে অভিনয় করল। ইবসেন সামান্য কিছু টাকাও পেলেন। তখন এই উৎসাহটুকু না পেলে নাটক রচনার পথ তিনি গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। নাটক অবশ্য তিন দিনের বেশী চলেনি।

প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক ওল্‌ বুল বার্গেনে একটি থিয়েটার স্থাপন করে ইবসেনকে আমন্ত্রণ জানালেন স্টেজ ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য। বেতন সামান্য হলেও সাগ্রহে এ আমন্ত্রণে ইবসেন সাড়া দিলেন। স্টেজ-ম্যানেজারের সাধারণ দায়িত্ব ছাড়া অভিনয়ের জন্য যত সীন প্রয়োজন হবে তা আঁকবার ভারও পড়ল তাঁর উপর। আর শর্ত থাকল বছরে একটি করে নতুন নাটক লিখে দেবার। বছর পাঁচেক ইবসেন এই কাজ করেছেন। এই পাঁচ বছরে নাটক রচনা ও প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত নাটকগুলি রচনার সময় তা কাজে লেগেছিল।

"ঈস্ট্রাটের লেডি ইঙগার" (১৮৫৫) তাঁর প্রথম নাটক যা দর্শকদের ভালো লেগেছে। অথচ পূর্বের নাটকগুলি সফল হয়নি বলে আশঙ্কায় ইবসেন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। "লেডি ইঙগার" ও "সোলহাউগের ভোজ" (১৮৫৬) এদুটি নাটকেই রোমান্টিসিজমের প্রভাব লক্ষণীয়। ডেনমার্কের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব হয়নি। স্টেজ-ম্যানেজার হিসাবে বার্গেনে ইবসেনের শেষ নাটক "ওলাফ লিলিয়েক্রান্‌স্‌" (১৮৫৭)। এটি স্বাদেশিকতামূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

আইস্‌ল্যান্ডের প্রাচীন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ইবসেন লিখলেন "দি ভাইকিঙ্‌স্‌ অ্যাট হেলগেল্যান্ড" (১৮৫৮)। তাঁর প্রথম যুগে রচিত নাটকগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোনো থিয়েটার এ নাটক অভিনয়ের জন্য নিতে রাজী হল না। নরওয়ের কাছ থেকে হতাশ হয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন ডেনমার্কে; সেখান থেকেও নাটক ফিরে এল। অনেক বছর পরে এই নাটকই সমাদৃত হয়েছে।

ইবসেনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল। ক্লারা এবেলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন রচনা করেছেন তাকে কেন্দ্র করে। ক্লারাও ইবসেনের লেখা সম্বন্ধে খুব

খাদ্যের অভাবে বড় কষ্ট হত। ক্ষুধার তাড়না যথাসম্ভব অগ্রাহ্য করে ইবসেন নানা বিষয়ের বই পড়তেন। এইসময়কার বই পড়বার অভ্যাস এবং সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভিজ্ঞতা পরবর্তী জীবনে তাঁকে বিশেষরূপে সাহায্য করেছে।

ইবসেন গ্রিমস্টাডে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করতেন। সামাজিক হবার জন্য যে সব চারিত্রিক গুণের প্রয়োজন ইবসেনের তা ছিল না। তার উপর কঠোর জীবনযাত্রা তাঁর তরুণ হৃদয় হতাশায় পূর্ণ করেছিল। উনিশ বছর বয়সে তিনি 'হতাশা' নামে একটি কবিতা লিখলেন। নিজের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনি এই কবিতায় বলছেন : "নাম-গোত্রহীন জনতার স্রোত আমাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে; তাদের একজন হয়ে আমি চিরদিনের জন্য হারিয়ে যাব।" ইবসেনের প্রথম কবিতা "শরৎ কালে" ছদ্মনামে প্রকাশিত হয় "ক্রিশ্চিয়ানিয়া পোস্ট" কাগজে।

একদিন বোন হেদভিগ-এর সঙ্গে আলাপ হচ্ছিল ভবিষ্যৎ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। ইবসেন বললেন, জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে আমি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ দৃষ্টি এবং পরিপূর্ণ মানসিক ক্ষমতা লাভ করতে চাই।

বোন জিজ্ঞাসা করল, লাভ করবার পরে কি করবে?

—তারপর হারিয়ে যাব,— "upwards, toward the peaks. Toward the stars. And toward the great silence."

মানসিক শক্তি বিকাশের জন্য উচ্চশিক্ষা প্রয়োজন। বন্ধু শ্লেরাদ বারবার লিখছে ক্রিশ্চিয়ানিয়া (বর্তমান অস্‌লো) এসে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে। ইবসেনেরও তা বহু দিনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু অর্থাভাব অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু একদিন সকল বাধা অগ্রাহ্য করে ক্রিশ্চিয়ানিয়া চলে এলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য ভর্তি হলেন স্কুলে। এখানে তাঁর আলাপ হল এমন অনেকের সঙ্গে যাঁরা পরবর্তী জীবনে সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নরওয়ের আর একজন খ্যাতনামা নাট্যকার বিয়রন্‌সন। পরবর্তী জীবনে ইবসেনের সঙ্গে তাঁর নানা কারণে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল।

প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল ভালো হল না। গণিত ও গ্রীক পরীক্ষায় খুব কম নম্বর পেলেন। শিক্ষকরা তাঁকে আর একবার পরীক্ষা দেবার জন্য উৎসাহিত করলেও তাঁর পড়বার আর আগ্রহ ছিল না।

ক্রিশ্চিয়ানিয়া শহরে এসে ইবসেনের উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ হল না। কিন্তু ক্ষুদ্র শহরের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে নরওয়ের শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্রে এসে তাঁর লাভ হল প্রচুর। তাঁর মনের দিগন্ত অনেক দূর প্রসারিত হল। ১৮৪৮ সালের ফরাসী বিপ্লবের ভাবধারার প্রভাব ইবসেনের মানসিক গঠন রূপান্তরিত করেছে। তিনি শ্রমিক সমস্যা, সাধারণ লোকের দুঃখ দুর্দশা এবং সামাজিক অত্যাচার সম্বন্ধে ভাবতে শিখলেন।

১৩৯৭ সালে ডেনমার্ক নরওয়ে জয় করে। প্রায় চারশ' বছর পরে, ১৮১৪ সালে, নরওয়ে স্বাধীনতা ফিরে পায়। এই দীর্ঘকালের পরাধীনতার ফলে ডেনমার্কের সংস্কৃতি নরওয়ের সংস্কৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল। রাজধানীতে এসে ইবসেন উপলব্ধি করলেন যে, দেশপ্রেমিক তরুণরা নরওয়ের সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেবার জন্য ব্যগ্র হওয়ায় দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক অধিকার দূর হবার পরও দীর্ঘকাল যাবৎ সাংস্কৃতিক প্রভাবটা থেকে যায়।

ফরাসী বিপ্লবের চিন্তাধারার উদ্দীপনা এবং সাংস্কৃতিক দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে ইবসেন

কিছুদিন ভবিষ্যৎ জীবনের পথ স্থির করতে পারেননি। কিছুকালের জন্য রাজনীতির দিকে তাঁর মন ঝুঁকেছিল। কিন্তু তাঁর শিল্পী মন রাজনীতিবিমুখ হল অল্প দিনের মধ্যেই। তিনি স্থির করলেন নাটকের মাধ্যমে দেশবাসীর মনে জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করবেন।

এই সঙ্কল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে ইবসেন রচনা করলেন তাঁর প্রথম নাটক "ক্যাটিলিন" (১৮৫০)। এই নাটকের ঐতিহাসিক পটভূমিকার সঙ্গে ইবসেন পরিচিত হয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য তৈরী হবার সময়। পদ্যে রচিত এই ট্র্যাজেডিতে সিসারোর উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা সত্ত্বেও পাঠকের সহানুভূতি বিদ্রোহী নায়ক ক্যাটিলিনের উপরেই পড়বে। ইবসেনের সে সময়কার মানসিক অবস্থার ছাপ পড়েছে এই নাটকে।

নাটক লেখা হল; কিন্তু কোনো থিয়েটারের কর্তৃপক্ষই অভিনয়ের জন্য গ্রহণ করতে রাজী হল না। প্রকাশকরা জানাল প্রকাশনের সকল ব্যয়ভার বহন করলে তারা এই নাটক ছাপাতে পারে। বন্ধুর প্রতিভার উপর শ্লেরাডের অগাধ বিশ্বাস। সে ঋণ করে আড়াই শ' কপি 'ক্যাটিলিন' ছাপাল। নাটকের কঠোর সমালোচনা বের হল কাগজে। বিক্রি হল না। ঋণের দুশ্চিন্তা তো আছেই; তার উপর দৈনন্দিন আহার সংগ্রহ করবার মতো সামর্থ্য দু' বন্ধুর কারোই ছিল না। একদিন ক্ষুধার জ্বালায় দু'শ' কপি বই পুরনো কাগজের দরে বিক্রি করে খাবার কিনে আনল।

সৌভাগ্যক্রমে ঐ বছরই "ভাইকিঙের কবর" একটি থিয়েটার গ্রহণ করে অভিনয় করল। ইবসেন সামান্য কিছু টাকাও পেলেন। তখন এই উৎসাহটুকু না পেলে নাটক রচনার পথ তিনি গ্রহণ করতেন কিনা সন্দেহ। নাটক অবশ্য তিন দিনের বেশী চলেনি।

প্রসিদ্ধ বেহালা বাদক ওল্ বুল বার্গেনে একটি থিয়েটার স্থাপন করে ইবসেনকে আমন্ত্রণ জানালেন স্টেজ ম্যানেজারের দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য। বেতন সামান্য হলেও সাগ্রহে এ আমন্ত্রণে ইবসেন সাড়া দিলেন। স্টেজ-ম্যানেজারের সাধারণ দায়িত্ব ছাড়া অভিনয়ের জন্য যত সীন প্রয়োজন হবে তা আঁকবার ভারও পড়ল তাঁর উপর। আর শর্ত থাকল বছরে একটি করে নতুন নাটক লিখে দেবার। বছর পাঁচেক ইবসেন এই কাজ করেছেন। এই পাঁচ বছরে নাটক রচনা ও প্রযোজনা সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন পরবর্তী সময়ে বিখ্যাত নাটকগুলি রচনার সময় তা কাজে লেগেছিল।

"ঈস্ট্রাটের লেডি ইঙগার" (১৮৫৫) তাঁর প্রথম নাটক যা দর্শকদের ভালো লেগেছে। অথচ পূর্বের নাটকগুলি সফল হয়নি বলে আশঙ্কায় ইবসেন ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিলেন। "লেডি ইঙগার" ও "সোলহাউগের ভোজ" (১৮৫৬) এদুটি নাটকেই রোমান্টিসিজমের প্রভাব লক্ষণীয়। ডেনমার্কের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়াও সম্ভব হয়নি। স্টেজ-ম্যানেজার হিসাবে বার্গেনে ইবসেনের শেষ নাটক "ওলাফ লিলিয়েক্রান্‌স্" (১৮৫৭)। এটি স্বাদেশিকতামূলক কাহিনী অবলম্বনে রচিত।

আইস্‌ল্যান্ডের প্রাচীন কাহিনীর উপর ভিত্তি করে ইবসেন লিখলেন "দি ভাইকিঙ্‌স্ অ্যাট হেলগেল্যান্ড" (১৮৫৮)। তাঁর প্রথম যুগে রচিত নাটকগুলির মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। কিন্তু কোনো থিয়েটার এ নাটক অভিনয়ের জন্য নিতে রাজী হল না। নরওয়ের কাছ থেকে হতাশ হয়ে পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছিলেন ডেনমার্কে; সেখান থেকেও নাটক ফিরে এল। অনেক বছর পরে এই নাটকই সমাদৃত হয়েছে।

ইবসেনের প্রথম প্রেম ব্যর্থ হয়েছিল। ক্লারা এবেলের সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন রচনা করেছেন তাকে কেন্দ্র করে। ক্লারাও ইবসেনের লেখা সম্বন্ধে খুব

উৎসাহ প্রকাশ করত। কিন্তু একদিন ক্লারা হঠাৎ এক প্রৌঢ় ব্যক্তির সঙ্গে তার বিয়ের কথা জানাল। স্বচ্ছল জীবনের লোভে সে অকস্মাৎ চলে গেল ইবসেনের জীবন-বৃত্তের বাইরে। এই আঘাত ইবসেনকে নারী-বিদ্বেষী করতে পারেনি। 'লেডি ইঙগারে' তিনি বলেছেন ঃ ইবসেন সুসানা থোরেসেনকে বিয়ে করেন। সুসানা সুদিনে-দুর্দিনে এবং সাহিত্য সাধনায় ইবসেনের সত্যকার সঙ্গিনী হতে পেরেছিল।

বিয়ে করবার পর সংসারের ব্যয় বাড়ল। কিন্তু আয়ের কোন নির্দিষ্ট পথ নেই। স্টেজ-ম্যানেজারের চাকরি গেছে। এখন তিনি ছোট একটা থিয়েটারের ডিরেক্টর। নরওয়ের রঙ্গ-মঞ্চের তখন মন্দার যুগ চলছে। তাই আয় নেই। ১৮৬২ সালে ইবসেনের নতুন নাটক "ভালো-বাসার কমেডি" বের হল। এই নাটকে একজন পাদ্রির চরিত্র যে ভাবে আঁকা হয়েছে তা সাধারণ লোকের নিকট কলঙ্কজনক মনে হয়েছিল। এ নিয়ে বেশ বিরূপ আলোচনাও চলেছিল অনেক দিন। পরবর্তী নাটক "প্রত্যারক" (১৮৬৪) নাট্যকৌশলের দিক থেকে উন্নত। যদিও বিষয়-বস্তু পুরনো। ত্রয়োদশ শতাব্দীর নরওয়ের গৃহযুদ্ধের গল্প।

দুটো নাটক লিখলেও আর্থিক সমস্যার কোনো সমাধান হল না। বিয়ারন্‌সন ও ইবসেন দু'জনেই সরকারের নিকট বৃত্তির জন্য আবেদন করলেন। বিয়ারন্‌সনের বৃত্তি মঞ্জুর হল। ইবসেনের আবেদনের উপর একজন সরকারী কর্মচারী মন্তব্য করলেন ঃ "ভালোবাসার কমেডির" মতো নাটককে লেখককে বৃত্তির পরিবর্তে পিঠের উপর কয়েক ঘা দিয়ে বিদায় করা উচিত।

প্রতিদ্বন্দ্বী নাট্যকার বিয়ারন্‌সনের সৌভাগ্য ইবসেনের নিকট ক্ষোভের কারণ হয়েছিল। ইবসেন তাই বলতেন যে, বিয়ারন্‌সনের তুলনায় তিনি হলেন 'God's stepchild on earth'. অত্যন্ত সংকটে পড়ে ইবসেন এই ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। যে থিয়েটারের তিনি ডিরেক্টর ছিলেন সেই থিয়েটার ঋণের দায়ে বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধুদের স্বেচ্ছাকৃত সাহায্যের উপর তাঁর নির্ভর। সংসারের অভাব-অনটন ভুলে থাকবার জন্য ইবসেন মদ ধরেছেন। লোকের ধারণা হল তাঁর মধ্যে প্রতিভার যেটুকু স্ফুরণ দেখা গিয়েছিল তার অপমৃত্যু ঘটেছে।

রাজার কাছে ব্যক্তিগতভাবে সাহায্যের আবেদন করেও বিশেষ ফল হল না। শুধু সামান্য একটা ভ্রমণ-বৃত্তি পেয়ে ১৮৬৪ সালে নরওয়ে থেকে যাত্রা করে ডেনমার্ক ও জার্মানী ঘুরে রোমে এসে পৌঁছলেন। এর পর থেকে জীবনের বহু বৎসর তাঁর কেটেছে নরওয়ের বাইরে। স্বদেশের উপর তাঁর গভীর অভিমান ছিল। দেশের লোক তাঁকে বুঝতে পারেনি, এই ছিল তাঁর ক্ষোভ।

অপরিচিত রোম শহরে অর্থ উপার্জনের কোনো সুযোগ তিনি পেলেন না। অনেক দিন তাঁর বাড়িতে খাবার থাকত না। তথাপি দেশের সমাজের সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি পেয়ে তাঁর মন শান্তি লাভ করল। আর এই শান্তি সহায়ক হল প্রথম শ্রেণীর নতুন সৃষ্টির। এখানে লিখে "ব্র্যাণ্ড" (১৮৬৬) ও "পীয়ার গিন্ট" (১৮৬৭) কাব্য-নাটক দুটি রচনা করেন। এই দুটি নাটকের মধ্যে ইবসেনের নাটকের সকল বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

"ব্র্যাণ্ড" প্রথমে লেখা হয়েছিল এপিক কাব্য হিসাবে। পরে নাট্যরূপ দেওয়া হয়। তরুণ পাদ্রি ব্র্যাণ্ড ধর্ম ও নীতির সঙ্গে কোনো প্রকার আপোষ করতে রাজী নয়। ধর্মের নির্দে-শকে আক্ষরিক অর্থে পালন করাই ছিল তার সাধনা। মানুষের চেয়ে ধর্ম ছিল ব্র্যাণ্ডের কাছে বড়। জীবনের বাস্তব পরিবেশকে অগ্রাহ্য করে নীতিশাস্ত্রের নির্দেশকে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল তার উদ্দেশ্য। সে বিশ্বাস করত "হয় সব, না হয় কিছু নয়" এই নীতিতে। তাই ধর্মের সঙ্গে

বাস্তব জীবনের মিলন ঘটাতে পারেনি। আপোষহীন মনোভাব বজায় রাখতে গিয়ে স্ত্রী অ্যাগ্-নিস এবং একমাত্র ছেলে আল্‌ফকে হারিয়েছে। তবু সে মাথা নত করেনি। কিন্তু গ্রামের লোক একদিন পাদ্রির নীতিনিষ্ঠার অত্যাচারে অস্থির হয়ে প্রবল তুষারপাতের মধ্যে তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিল। এই প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে নির্জন পাহাড়ের উপরে ব্র্যাণ্ড প্রাণ হারাল। মৃত্যুর পূর্বে ঈশ্বরের নিকট ব্র্যাণ্ড জানতে চাইল, সে কি অপরাধ করেছে। দৈববাণী হল, ঈশ্বরই প্রেম। অর্থাৎ, ভগবানের প্রেমময় রূপকে অগ্রাহ্য করে শাস্ত্রকে উর্দ্ধে স্থান দিয়েছে বলেই তোমার এই দুর্দশা।

"পীয়ার গিন্ট" রোমান্টিক কাব্য-নাটক। নরওয়ের প্রাচীন কাহিনী অবলম্বনে এই নাটক রচিত। পীয়ার নরওয়ের এক চাষীর ছেলে। আত্মম্ভরি গুণ্ডা প্রকৃতির পীয়ার নানা দেশ ঘুরে মৃত্যুর পূর্বে নরওয়ে ফিরে এল। বিভিন্ন দেশে পীয়ারের বিচিত্র অ্যাডভেঞ্চার এবং মা 'আশে' ও প্রণয়িনী সল্‌ভেইগের চরিত্র কাহিনীর প্রধান আকর্ষণ। কতকগুলি রূপক চরিত্র ও ঘটনার সাহায্যে ইবসেন তাঁর বক্তব্য বোঝাতে চেয়েছেন। এক হিসাবে পীয়ারকে ব্র্যাণ্ডের প্রতিচরিত্র বলা যেতে পারে। ব্র্যাণ্ডের ছিল আপোষহীন শাস্ত্র-বচন-নিষ্ঠা। পীয়ার সমাজের উচ্চ স্তরে উঠে নিজের সম্বন্ধে মিথ্যা প্রচার করে অন্যকে প্রতারণা করেছে। তার জীবনে নীতির কোনো ভিত্তি ছিল না। পীয়ারের চরিত্র বিশ্লেষণ করে ইবসেন সে সময়কার নরওয়ের সমাজের ত্রুটিগুলি দেখাতে চেয়েছেন। সে সময় নরওয়ের সমাজে নীতির ভিত্তি ছিল কাঁচা। কিন্তু ধর্মের আড়ম্বরে কার্পণ্য ছিল না।

"ব্র্যাণ্ড" লেখার পর থেকে ইবসেনের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা দেখা দেয়। বিয়ারন্‌সনের সঙ্গে যতই রেষারেষির ভাব থাক, তিনিই ইবসেনকে "ব্র্যাণ্ডের" জন্য প্রকাশক স্থির করে দিলেন। নরওয়ের কোনো প্রকাশক পাওয়া গেল না। হেগেল নামে কোপেনহেগেনের এক প্রকাশক "ব্র্যাণ্ড" প্রকাশ করল। এক বছরের মধ্যে চারটি সংস্করণ নিঃশেষ হয়ে গেল। ঊনবিংশ শতা-ব্দীর নরওয়ের সাহিত্যে এটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইবসেন যেমন প্রকাশক পেয়েছিলেন তেমন প্রকাশক পাওয়া খুবই সৌভাগ্যের কথা। এর পর থেকে ইবসেনকে কখনো অনাহারে থাকবার দুঃস্বপ্ন দেখতে হয়নি। যখনই বিপদে পড়েছেন প্রকাশক বন্ধু সাহায্যের জন্য এগিয়ে এসেছে।

১৮৬৬ সালে সরকার আজীবন বৃত্তি মঞ্জুর করায় ইবসেন নিশ্চিন্ত মনে সাহিত্য সাধনা শুরু করলেন। তবে নরওয়ের পাঠক ও দর্শকদের উপেক্ষা তাঁর পক্ষে গভীর বেদনার কারণ হয়েছিল। ইবসেনের চিন্তা এত অগ্রগামী ছিল যে সমসাময়িক সমাজ তাঁকে ঠিক গ্রহণ করতে পারেনি।

ইবসেন কুড়িটির বেশী নাটক লিখেছেন। প্রত্যেকটিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। এদের মধ্যে "পিলারস্ অব সোসাইটি" (১৮৭৭), "এ ডল্‌স্ হাউস" (১৮৭৯), "গোস্টস্" (১৮৮১), "অ্যান্ এনিমি অব দি পীপল" (১৮৮২), "দি ওয়াইল্ড ডাক" (১৮৮৪), "হেড্ডা গ্যাবলার" (১৮৯০), "দি মাস্টার বিল্ডার" (১৮৯২) প্রভৃতি নাটকগুলি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তবে ইবসেনের আধুনিকতা ও বাস্তবতার সূচনা হয়েছে "দি লীগ অব ইয়ুথ" (১৮৬৯) বা যুবসঙ্ঘ নাটক। এটি রাজনীতিমূলক নাটক। এতদিন তিনি কাব্য-নাটক লিখেছেন। "যুব-সঙ্ঘ" গদ্যে রচিত। নায়ক একজন তরুণ আইনব্যবসায়ী। এক জমিদারের নিকট অপমানিত হয়ে রাতারাতি বামপন্থী রাজনৈতিক নেতায় পরিণত হল। দলবল নিয়ে জমিদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। জমিদার আন্দোলন বন্ধ করবার জন্য এক বড় পার্টিতে যুবক নেতাকে আমন্ত্রণ করে সমাজের অ্যারিস্টোক্র্যাটদের দিয়ে তাকে আপ্যায়িত করাল। যাদের শুধু দূর থেকে দেখেছে

তাদের কাছ থেকে সম্মান পেয়ে গৌরবান্বিত বোধ করল বামপন্থী নেতা। আবার রাতারাতি তার মত বদলে গেল। এবার সে হল অভিজাত সম্প্রদায়ের ভক্ত। রাজনৈতিক নেতাদের আদর্শের পশ্চাতে যে নিষ্ঠা নেই ইবসেন এই নাটকে সে কথাই ইঙ্গিত করেছেন।

"পিলারস্ অব সোসাইটিতে" ইবসেন সমাজের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের ব্যক্তিগত জীবনের দুর্নীতি উদ্‌ঘাটিত করে দেখিয়ে বলেছেন যে বামপন্থী, দক্ষিণপন্থী বা উদারপন্থী কোনো নেতাই সমাজের উন্নতির জন্য কিছু করতে পারবে না। নেতার উপর নির্ভর না করে ব্যক্তির কর্তব্য আত্মোন্নতির চেষ্টা করা। ব্যক্তির উন্নতির দ্বারাই সমাজের স্থায়ী উন্নতি হতে পারে।

"এ ডল্‌স্ হাউস" ইবসেনের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাটক। পৃথিবীর সকল দেশে নোরা সমাদর লাভ করেছে। এবং এই আশি বছরের ব্যবধানেও জনপ্রিয়তা ক্ষুণ্ণ হয়নি। অভিনয় দেখবার সুযোগ হয়ত আজকাল কমই হয়; কিন্তু পাঠকদের মধ্যে "ডল্‌স্ হাউসের" চাহিদা এখনো আছে। এই একটি বই নারীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতার জন্য যা করেছে পৃথিবীর আর কোনো বই তা করতে পারেনি। কিন্তু তাই বলে একে স্ত্রী-স্বাধীনতার প্রচার পুস্তক হিসাবে দেখাও ভুল হবে। ইবসেনের কোনো মতবাদ প্রচার করা উদ্দেশ্য ছিল না। নারী যে পুরুষের মতোই ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ না করলে সংসারে যে শান্তি পাওয়া যায় না, একথা ইবসেন খুব জোরের সঙ্গে বলেছেন। ডল্‌স্ হাউস্ নাট্যগুণেও বিশেষরূপে সমৃদ্ধ।

নোরা হেলমার বাবার বাড়ি এবং স্বামীর বাড়িতে আদরের মধ্যে মানুষ হয়েছে। সবাই তাকে পুতুলের মতো আদর করেছে, সংসারের দুঃখ ও সমস্যা তাকে যাতে স্পর্শ করতে না পারে সকলের ছিল সেই চেষ্টা। স্বামীর অসুখ হয়েছে; তাঁকে সাহায্য করবার জন্য সে গোপনে টাকা ধার করল। কিন্তু নোরাকে টাকা ধার দেবে কে? তাই সে বাবার সই জাল করল দলিলে। জাল সই ধরা পড়বার পর এ নিয়ে মামলা হবার আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় হেল্‌মার ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। স্ত্রী নীতিভ্রষ্ট বলে সে আর ছেলেমেয়েদের তার হাতে দিতে পারে না। নোরার তাদের স্পর্শ করবার অধিকার নেই। কিন্তু অকস্মাৎ যখন মামলার আশঙ্কা দূর হয়ে গেল তখন হেলমার সবকিছু এক নিমেষে ভুলে গিয়ে ঠিক আগের মতোই নোরাকে আদর করতে আরম্ভ করল। নোরা এবার তার জীবনের ফাঁকি বুঝতে পেরেছে। তাকে নিয়ে প্রাণহীন পুতুলের মতো যখন যা খুশি ব্যবহার করতে সে আর দেবে না। দুপুর রাত্রিতে এক বস্ত্রে স্বামীর বাড়ি থেকে সে বেরিয়ে গেল। নিজেকে জানবে, সংসারের রীতিনীতির সঙ্গে পরিচিত হবে, আত্মনির্ভর হবে; তবে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যথার্থ মিলন সম্ভব।

দুপুর রাত্রিতে বাড়ির বাইরে এসে দরজা বন্ধ করতে নোরা যে শব্দ করেছিল তার প্রতিধ্বনি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ল। প্রগতিকামী মেয়েরা পেল নতুন উদ্দীপনা; সংরক্ষণশীল সমাজপতিরা ধিক্কার দিল নোরাকে। অন্তঃপুরের পবিত্র পীঠস্থানেও এবার নোরার হাত এগিয়ে এসেছে। সব গেল, আর রক্ষা নেই। স্বামী-স্ত্রীর এমন বিচ্ছেদ অধিকাংশ লোকই মেনে নিতে পারেনি। অনেক লেখক নোরা ও হেলমারের মিলন দেখিয়ে বই লিখল। দু'চার জন লোক একত্রিত হলেই নোরার কথা উঠত; বাগবিতণ্ডা থেকে হাতাহাতি। তাই কয়েক বছর যাবৎ পার্টির নিমন্ত্রণ পত্রে গৃহকর্তা লিখে দিত: নোরা সম্বন্ধে পার্টিতে আলোচনা নিষিদ্ধ।

১৮৮০ সালে মিউনিকে "ডল্‌স্ হাউস" যখন প্রথম অভিনীত হয় তখন ইবসেন দর্শকদের মধ্যে বসে অভিনয় দেখতে শঙ্কা বোধ করেছেন। কি জানি কি প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে! ইবসেনের স্ত্রীও হলে আসেননি। প্রত্যেকটি অঙ্ক নির্বিঘ্নে সমাপ্ত হবার পর লোক

মারফৎ স্ত্রীকে সংবাদ পাঠানো হয়েছে। ইবসেন নিজে উইংএর পাশে দাঁড়িয়ে অভিনয় দেখেছেন।

"গোস্টস" "ডল্‌স্ হাউসের" মতোই এখনো জনপ্রিয়। এখনো য়ুরোপের রঙ্গমঞ্চে এর অভিনয় দর্শকদের আকৃষ্ট করে। জীবনের ট্রাজেডি এই নাটকে এমন শিল্প-সমৃদ্ধ রীতিতে প্রকাশ করেছেন যে দর্শক ও পাঠক অভিভূত হয়ে পড়ে। প্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ বলেছেন: Ghosts was Ibsen's noblest deed; forever link the name of Ibsen with that of Sophocles.

যৌনব্যাধির কুফল বংশপরম্পরা জীবনে কী গভীর ট্র্যাজেডির সৃষ্টি করে "গোস্ট্‌স্" তার জীবন্ত আলেখ্য। কিন্তু এই নাটক শুধুই যৌনব্যাধির বিরুদ্ধে সাহিত্যরসাবৃত অভিযান নয়। ইবসেন জীবনের গভীরতর প্রশ্নের অবতারণা করেছেন। চিরাগত কর্তব্যবোধের সঙ্গে ন্যায় ও সত্যের বিরোধ। নায়িকা শ্রীমতী আল্‌ভিং দুশ্চরিত্র স্বামীকে ঘৃণা করা সত্ত্বেও নোরার মতো সংসার ত্যাগ করে চলে যেতে পারেনি। বন্ধুবান্ধবের ক্রমাগত উপদেশ তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যবোধ। স্বামী যা-ই হোক স্ত্রী তাকে কখনো ত্যাগ করে যেতে পারে না। শ্রীমতী আলভিং-এর এই অক্ষমতার মধ্যেই ট্র্যাজেডির সূত্রপাত। তাদের ছেলে অস্‌ওয়াল্‌ড বাবার কাছ থেকে যৌনব্যাধির বীজ নিয়ে জন্মগ্রহণ করল। অস্‌ওয়ালড নিরপরাধ, কিন্তু পিতার পাপের মূল্য তাকে দিতে হবে। তরুণ শিল্পী অস্‌ওয়াল্‌ড অকস্মাৎ যৌনব্যাধির আক্রমণে পাগল হয়ে গেল। বেঁচে থেকে যে যন্ত্রণা তাকে ভোগ করতে হবে তার চেয়ে মৃত্যু ভালো। তাই অনেক দ্বিধার পর শ্রীমতী আলভিং মা হয়ে ছেলের মুখে বিষ তুলে দিল।

যৌনবিষয়ে প্রকাশ্য আলোচনা তখন নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং নরওয়ের জনসাধারণ এই নাটকের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করল। ফলে এর অভিনয় নিষিদ্ধ হল। এমনকি, অভিনেতা অভিনেত্রীরাও অভিনয় করতে রাজী হল না।

"গোস্টস্"-এর বিরূপ অভ্যর্থনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইবসেন জর্জ ব্র্যান্ডেসকে ১৮৮২ সালের জানুয়ারী মাসে এক চিঠিতে লিখছেন: When I think how slow and heavy and dull the general intelligence is at home, when I notice the low standard by which everything is judged, a deep despondency comes over me, and it often seems to me that I might just as well ending literary activity at once. They really do not need poetry at home; they get along so well with the Parliamentary news and the Lutheran Weekly.

"গোস্ট্‌স"-এর সমালোচকদের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ইবসেন "অ্যান এনিমি অব দি পীপল" লিখেছেন। বহুলোক মিলিত ভাবে যা বলে তা যে সত্য নয় এটাই দেখবার চেষ্টা করা হয়েছে এই নাটকে। গণতন্ত্রের 'মেজরিটি রুলকে' তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। বহু লোকে বিরোধিতা করেছে বলে "গোস্টস"-এর মূল্য ক্ষুণ্ণ হয়নি, এটাই তাঁর ইঙ্গিত। ডাঃ স্টক্‌মান শহরের জল দূষিত হয়েছে বলে কর্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট দেন। তিনি ভেবেছিলেন, কর্তৃপক্ষ এজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। কিন্তু ফল হল উল্টো। এই তথ্য প্রচারিত হলে টুরিস্টরা আর আসবে না। শহরের আয় কমে যাবে। সুতরাং কর্তৃপক্ষ এমন মারাত্মক সত্যকে গোপন করতে ব্যগ্র। আর ডাঃ স্টক্‌মান জীবন পণ করে তাঁর আবিষ্কৃত তথ্য প্রচার করতে লাগলেন।

"দি ওয়াইল্ড ডাক" অনেকের মতে ইব্‌সেনের শ্রেষ্ঠ নাটক। এই প্রতীক ধর্মী নাটকে ইব্‌সেন দেখিয়েছেন সংস্কারক অনেক সময় কেমন করে মানুষের জীবনে সর্বনাশ ডেকে আনে।

ইব্‌সেন নাটকের গ্রেগার্‌স্‌ চরিত্রের মাধ্যমে নিজেকেও ব্যক্ত করেছেন। গ্রেগার্স একদিন জানতে পারল তার বন্ধু একডাল বিয়ে করেছে তাদের ভূতপূর্ব পরিচারিকা গিনাকে। স্বামী-স্ত্রী বেশ সুখেই আছে। গ্রেগার্স জানে তার বাবা গিনার প্রতি আসক্ত ছিলেন। তার মনে হল বন্ধুকে সত্য কথা জানানো তার অবশ্য কর্তব্য। গিনা স্বামীর কাছে কিছুই গোপন করল না। এর ফলে তাদের সুখের সংসার ছারখার হয়ে গেল। এমনকি, গ্রেগার্‌স্‌-এর সত্যপ্রীতির দণ্ড হতে মুক্তিলাভের জন্য একডালের ছোট মেয়ে হেদ্‌ভিগকেও আত্মহত্যা করতে হল।

"হেড্ডা গ্যারলার" ইবসেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির অন্যতম। বিশেষ করে রঙ্গমঞ্চে নাটক উপস্থিত করবার কৌশলের দিক থেকে বিচার করলে এটি যে শ্রেষ্ঠ নাটক সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। এই নাটকে নায়িকা অন্য সকল চরিত্রের উপরে প্রাধান্য লাভ করেছে। হেড্ডা গ্যাবলারের ফুবেয়ারের এম্মা বোভারির সগোত্র বলে মনে হয়। ইব্‌সেন এই নাটকে কোনো সামাজিক সমস্যাকে প্রধান করেননি। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ এবং হৃদয়ের অনুভূতি সহজভাবে দেখাতে চেয়েছেন। হেড্ডা ভুল করে এক মধ্যবিত্ত অধ্যাপককে বিয়ে করেছে। সে এখন এই বিয়ের জন্য অনুতপ্ত। তার ভূতপূর্ব প্রেমিক বই লিখে খ্যাতি লাভ করবার পর হেড্ডা আবার যোগাযোগ স্থাপন করে লভ্‌বর্গকে অধঃপতনের পথে নিয়ে এল। লভ্‌বর্গের হিতৈষী বইয়ের পাণ্ডুলিপি হাতে পেয়ে ধ্বংস করে ফেলল হেড্ডা। তারপর লভ্‌বর্গের হাতে পিস্তল দিয়ে তাকে আত্মহত্যার জন্য প্ররোচিত করল। কারণ হেড্ডার নিকট আত্মহত্যা মহৎ ও সুন্দর। যখন ধরা পড়ল যে হেড্ডার প্ররোচনায় লভ্‌বর্গ আত্মহত্যা করেছে তখন হেড্ডাও আত্মহত্যা করল। একটি খেয়ালী নারীর ব্যর্থ জীবনের মর্মস্পর্শী ট্র্যাজেডি এই নাটক।

নরওয়ের রাজধানীতে ফিরে ইব্‌সেন লিখেছেন "মাস্টার বিল্ডার।" এই প্রতীকী নাটকটি অনেকাংশে আত্মজীবনীমূলক। শিল্পী শিল্পের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য দৈনন্দিন জীবনের কতটা ত্যাগ করতে পারে? প্রেম, শান্তি ও মানুষের প্রতি কর্তব্য ভুলে শুধুই কি উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য অন্ধের মতো এগিয়ে যাবে? এই প্রশ্নের উত্তর নাটকের মধ্য দিতে চেয়েছেন ইবসেন। খ্যাতনামা স্থপতি সল্‌নেস্‌কে তরুণী হিল্‌দা প্ররোচিত করে নিয়ে গেল এমন কাজ করতে যা তার ক্ষমতার বাইরে। সল্‌নেস খুব উঁচু এমন এক স্তম্ভ তৈরী করল যা কেউ দেখেনি। কিন্তু সেই স্তম্ভের চূড়া থেকে পড়ে স্থপতি প্রাণ হারাল। প্রবীণ লেখকদের বাধা দিয়ে তরুণ লেখকদের এগিয়ে যাবার অশোভন ব্যগ্রতার প্রতি ইব্‌সেন ইঙ্গিত করেছেন।

নাটকে বাস্তবতার প্রবর্তন ইবসেনের শ্রেষ্ঠ দান। পদ্যের পরিবর্তে তিনি পাত্র-পাত্রীদের মুখে দৈনন্দিন জীবনের ভাষা দিয়েছেন। সমসাময়িক জীবনের সমস্যায় জর্জরিত নর-নারীকে তিনি উপস্থিত করেছেন তাঁর নাটকে। তাঁর পূর্বে বাস্তব জীবনের সমস্যা নিয়ে নাটক রচনা কেউ করেননি। এই সমস্যাগুলি একান্তরূপে সাময়িক ছিল এমন কথা মনে করলে ভুল করা হবে। অধিকাংশ সমস্যার বীজ মানব চরিত্রের গভীরতায় নিহিত। তাই সকল যুগেই এই সমস্যাগুলি আত্মপ্রকাশ করে। হয়ত একটু ভিন্ন রূপে। সুতরাং ইব্‌সেনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলি এখনো আমাদের কাছে পুরনো হয়নি। কিন্তু নিছক বাস্তবতার ভিত্তির উপর যদি নাটকগুলি রচিত হত তাহলে এদের ভাগ্য সম্বন্ধে আশঙ্কা ছিল। ইঙ্গিতময়তা ও আদর্শবাদ তাদের বাঁচিয়েছে। "ডল্‌স্‌ হাউসের" কাহিনীর সব কিছুই বাস্তব। কিন্তু নোরা যেখানে কোনো এক অজানিত "আশ্চর্য ঘটনার" উপর সংকট ত্রাণের জন্য আশা করছে সেখানে সে আদর্শবাদী। তার ঐকান্তিক আশার ব্যর্থতা নর-নারী নির্বিশেষে প্রত্যেককে গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

ইবসেনের নাটকীয় ঘটনা সংস্থানের কৌশল, চরিত্র সৃষ্টি, সংলাপ, নাটকের বাণী ইত্যাদি

প্রথম শ্রেণীর। তাঁর কৃতিত্বের জন্য আমরা প্রশংসা করি। কিন্তু তাঁকে অন্তরঙ্গ মনে হয় না, তাঁকে ভালোবাসতে পারি না;—যেমন পারি শেক্সপীয়ারকে। শ্লেষাত্মক সমালোচনার প্রাধান্যই এর জন্য দায়ী। সমালোচনা কারো পছন্দ নয়, সত্য হলেও না। তাই কেউ কেউ বলেন, ইবসেন প্রশংসার স্তর থেকে অন্তরঙ্গতার স্তরে পৌঁছতে পারেননি। তাঁর রচনা সমালোচনাত্মক, গঠনাত্মক নয়। এই অভিযোগের উত্তরে ইব্‌সেন বলেছেন : Different people have different duties assigned to them by Nature; . . . Each bird must sing with his own throat and thus fulfil the task assigned him by Nature, and his justification must be that he can in truth say like Luther: "I can do no other!"

ইবসেন তাঁর জীবনদর্শন সম্বন্ধে বলেছেন :

To live is to war with friends, To write is to summon oneself,
That invest the brain and the heart; And play the judge's part.

এখানেও দেখছি ইবসেন লেখককে বিচারক হিসাবে দেখছেন। হৃদয়বত্তা অপেক্ষা সমালোচনার প্রবৃত্তির আধিক্য দেখে বিয়ারন্‌সনও বিদ্রূপ করে বলেছেন : Ibsen is not a man; he is only a pen.

প্রথম জীবনে দারিদ্র্যের পীড়নে ইবসেন অনেক দুঃখ ভোগ করেছেন; দেশবাসী তাঁর প্রতিভার যোগ্য মর্যাদা দেয়নি; বরং তাদের বিরূপতার জন্য তিনি বহু নির্যাতন ভোগ করেছেন। যাদের বন্ধু হিসাবে দেখেছেন তাদের কাছ থেকেও জ্বালাতন ভোগ করতে হয়েছে। তরুণ লেখক ক্নুট হামস্‌নের 'বুভুক্ষা' বইটি মাত্র বেরিয়েছে। হামস্‌ন এসে বিশেষ করে অনুরোধ করলেন তিনি সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা দেবেন, সেই বক্তৃতায় ইবসেনকে উপস্থিত থাকতে হবে। জনাকীর্ণ সভায় ইবসেন গিয়ে বসেছেন। আর তখন হামস্‌ন বক্তৃতামঞ্চ থেকে একে একে ইব্‌সেনের নাটকগুলির উপর আক্রমণ চালাতে লাগলেন। ইব্‌সেনের রচনা যে কিছুই নয় তা-ই হল হামস্‌নের প্রতিপাদ্য বিষয়। ইব্‌সেন অসহায়। শ্রোতাদের দৃষ্টির শরশয্যার উপর শেষ পর্যন্ত তাঁকে বসে থাকতে হল।

বন্ধুত্বের তিক্ত অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে ব্র্যান্ডেস্‌কে এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন : Friends are an expensive luxury, and if a man's entire capital is invested in a calling and a mission in life, he cannot afford to keep them. The costliness of keeping friends does not lie in what one does for them, but in what, out of consideration for them, one refrains from doing." জীবনের বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার ফলে ইব্‌সেনের দৃষ্টিভঙ্গী স্বাভাবিকরূপেই সমালোচনাত্মক হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ইতালী ও জার্মানীতে কাটিয়ে শেষ বয়সে ইব্‌সেন দেশে ফিরে নানা সম্মান লাভ করেছিলেন। ডেনমার্কের সরকার তাঁকে নাইট পদে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি সুইডেনের আপসালা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেলেন ডক্টরেট উপাধি। তাঁর সত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে যে উৎসবের আয়োজন করা হয় তাতে বিদেশ থেকে অনেক শিল্পী ও লেখক এসেছিলেন অভিনন্দন জানাতে। এঁদের মধ্যে বার্ণার্ড শ' অন্যতম।

১৯০৬ সালের ২৩শে মে ইব্‌সেন পরলোক গমন করেন। তাঁর নিরলঙ্কার স্মৃতি-মন্দিরে কোনো কথা লেখা নেই; এমনকি, ইব্‌সেনের নাম পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা হয়নি। শুধু আঁকা আছে খনি-মজুরের অত্যাবশ্যক হাতিয়ার একটি হাতুড়ি। খনি-মজুরের মতো তিনিও মানুষের মনের অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর খনি থেকে সম্পদ আহরণ করে বিশ্ব-সাহিত্য সমৃদ্ধ করেছেন।

কবি ঈশ্বর গুপ্ত ও বাংলা সাহিত্যের বিকাশ

রতন সান্যাল

মহৎ কোন তত্ত্ববিষয় ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আমরা পেয়েছি—এ-কথা বললে আধুনিক বিদগ্ধ-সমাজকে শান্ত অবশ্য করা যাবে না, কিন্তু আধুনিক কাব্য সাহিত্যে যে-বস্তু-রুচি, মানববোধ ও সমাজ-চেতনার স্পষ্টতা ক্রমশ প্রকাশ পাচ্ছে, ঈশ্বর গুপ্ত যদি তাঁর কাব্যে তার সূচনা করে গিয়ে থাকেন, তবে—তাঁর কবিতায় তত্ত্বমহত্ত্ব কিছু যদি না-ও পাই—বিশিষ্ট কবি বলে তাঁকে স্মরণ করব। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁর গুরুত্ব—ঐতিহাসিক গুরুত্ব; এবং এই গুরুত্বের জন্যই ঈশ্বর গুপ্তকে আমরা স্মরণ করি। সাহিত্যে প্রাচীন আর আধুনিকের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে যিনি দুই যুগকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছেন, একদিকে পুরাতন ধারার অনুবর্তন অন্যদিকে নবীন ধারার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন তিনি কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। দুই ধারার একদিকে প্রাচীন-বন্দনা অপরদিকে মানব-বন্দনা—এই দুয়েরই সমাবেশ ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে। তাই বোধ হয় তাঁকে যুগসন্ধি বা যুগ সমন্বয়ের কবি বলা হয়।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ঈশ্বর গুপ্ত থেকেই সাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হল—আধুনিক বিকাশের দিকে বহুমুখীন হয়ে উঠল বাংলা সাহিত্য। ঈশ্বর গুপ্তের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে এলেন অনেকে—সাহিত্যের সাগর সাঙ্গমে। কবি রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের গতি অব্যাহত বয়ে চলল—তাই আজকের যুগের সাহিত্যে তার পরীক্ষা নিরীক্ষার অন্ত নেই। ভাগীরথীর পবিত্র জলধারার মত বাংলা সাহিত্য বিশ্ব-সাহিত্যের মহাসঙ্গমে অগ্রগতির ধারা বয়ে নিয়ে এল। দেবাদিদেবের জটাজাল থেকে যেমন গঙ্গার সৃষ্টি, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিকাশের উৎস-ও তেমনি ঈশ্বর গুপ্ত—একথা স্মরণ করার সময় এসেছে। যাঁর কাছ থেকে প্রথম আমরা 'দেশের কুকুর'কে বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া' ভালবাসতে শিখেছি, বাইরে শত্রুর পদশব্দ শুনে বারবার যিনি ভারতসন্তানদের আলস্য নিদ্রা ভেঙে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন সেই গুপ্ত কবিকে তো ভুলে গেলে চলবে না।

তখন য়ুরোপীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতির হাওয়া বঙ্গোপসাগরের কূলে সবে এসে তরঙ্গায়িত করছে। উনিশ শতকের সে আলোড়ন পরবর্তী যুগে বাঙালীর চিন্তা ও ধ্যান ধারণার ক্ষেত্রে, সাহিত্য শিল্প ও জীবন ধারায় পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। কিন্তু এই পরিবর্তন সাধিত হবার আগে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রথম তরঙ্গাভিঘাতে বাঙালীর জীবন ও মানসে ভাঙন দেখা দিয়েছিল। ইংরেজি শিক্ষার মোহে দেশীয় আচার ব্যবহার বর্জন ও বিদেশীয় অনুকরণ প্রিয়তা অর্জনের কালে ঈশ্বর গুপ্ত বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। বিদেশীয়ানার ঝোঁকে বাঙালীয়ানা লুপ্ত প্রায়—কী আচার-ব্যবহার, কথায়-বার্তায়, ভাবে-ভঙ্গিতে সাহেবী কেতা দুরন্তের প্রাধান্য। বাঙালীর জীবনধারা বিদেশী অনুকরণ প্রিয়তার মোহে এদেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়ছিল। তাই খাঁটি বাঙালীয়ানা বলতে যা বোঝায় তা কোথাও ছিল না। সেকালের সাহিত্যে খাঁটি বাঙালীয়ানা প্রকাশই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য,—কবিদেরও তাই। খাঁটি বাঙালী কবি বলতে যা বোঝায় ঈশ্বর গুপ্ত সেই ধারার শেষ কবি। তাঁর কবিতাবলীতে বাঙালীর প্রাণের ভাষা শেষ বারের মত স্পন্দিত হয়ে থেমে গেল। থেমে গেল, কেননা, ঈশ্বর গুপ্তের পর আজ পর্যন্ত বাঙালী কবিদের মধ্যে বোধ হয় আর কেউ বাঙালীর অন্তরের মর্ম-

কথাটি তেমন করে আর প্রকাশ করতে পারেনি—বাংলার একান্ত গ্রামীন্, একান্ত স্বাভাবিক মর্মমূলের মাটির কবিতাটি—যা মাটি দিয়ে গড়া, ছায়া ঘেরা প্রকৃতির সহজ আটপৌরে রূপটির মত স্নিগ্ধ আর শান্ত। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ প্রকাশ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন তা থেকে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার নির্ভেজাল খাঁটি রূপটি ধরা পড়ে : ... খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি।...মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি।...এই কবিতাগুলি মায়ের প্রসাদ। তাই সংগ্রহ করিলাম।'

যে যুগে ঈশ্বর গুপ্তের আবির্ভাব সেটা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ (১৮১২-৫৯ খৃঃ)। প্রায় শতাব্দীপূর্বে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁর তিরোধান ঘটে তিনি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (মৃত্যু: ১৭৬০ খৃঃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র। এই দীর্ঘ শতবর্ষের সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—সাহিত্যে দেবদেবীর প্রাধান্য। দেবতাদের প্রেমঘটিত তত্ত্বগর্ভ কাহিনী শুনতেই লোক ভালবাসত। তাই লৌকিক কাহিনীগুলি দেবতাদের কীর্তিকাহিনী হয়ে ভক্তের জয়জয়কার পড়েছে। কোথাও দেবীর পূজা প্রচারের জন্য মঙ্গলগাথা, পাঁচালি, ছড়া, খেউড়, আফ-আকড়াই, কবিগান, তরজা প্রভৃতি বাংলা সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসে আছে। সে যুগে তখনো রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। রাজা মহারাজারাই ছিলেন গুণ্ডার ধর্মকর্ম শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক—রাজানুগ্রহ না পেলে কবি তো দূরের কথা সাধারণ মানুষের জীবনধারণ দুর্বিষহ হয়ে উঠত। তাই নিছক মানুষের সুখদুঃখের প্রেম-প্রীতির স্নেহমধুর কাহিনী কোন কবির পক্ষেই রচনা করা সম্ভব ছিল না। যে যুগে রাজা-রাজড়ার সভাকবি হওয়া ছাড়া কবিদের গত্যন্তর ছিল না, রাজাদের মনোরঞ্জন করাই যে যুগের সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, দেবদেবীর ছদ্মবেশে রাজাদের কীর্তিকাহিনী কবিদের রচনা করতে হত নিছক মাসোহারার জন্য—সেই সভাকবি যুগের অন্তিম কালে বাংলা সাহিত্যে এলেন কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। ঈশ্বর গুপ্ত থেকেই রাজসভামুখী সাহিত্যের মোড় ফিরল, জনসভা-মুখী সাহিত্যের জয়যাত্রা সুরু হল—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রশস্ত রাজপথ তৈরি হতে লাগল।

বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের বড় পরিচয়, তিনি কর্মী। কর্মীর পরিচয় তাঁর কর্ম-সাধনার মধ্য দিয়ে ও কর্মসাধনাই কর্মকে মহত্ত্ব দান করে। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যকর্ম এই কর্মীরূপেই। সাহিত্যিক-কর্মীর বড় সাফল্য লেখক সৃষ্টির কাজে—কর্মী ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সারা জীবনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টায় এ-সফলতা অর্জন করেছেন। তাঁর 'প্রভাকরে'র পাঠশালায় বাংলা সাহিত্যে কীর্তিমান অনেক কবি সাহিত্যিকের হাতেখড়ি হয়েছিল—এ-কথা সর্বজনবিদিত। তাই বলা সাহিত্যে তাঁকে প্রথম জার্নালিষ্ট কবি বলা হয়।

সেকারণে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় চিরন্তন কালের সাহিত্যিক মূল্য—যা কালকে অতিক্রম করে কালান্তরে অমর করে রাখবে—তা খুঁজতে যাওয়া বৃথা সন্দেহ নেই। শাশ্বত কালের সাহিত্যিক মর্যাদায় তাঁকে ভূষিত করা যাবে না—যে মর্যাদায় কালিদাস, সেক্সপিয়র, গ্যেটে কি রবীন্দ্রনাথকে আমরা ভূষিত করেছি। কিন্তু যুগ কবি বলে তো স্বীকার করতে বাধা নেই। তিনি যে তাঁর কালের কবি—তাঁর কালের ব্যথা বেদনা, সমাজ-দেশ-মানস তাঁরি লেখনীতে ভাষা পেয়েছে এ-কথা কে অস্বীকার করবে। কোন কবিকেই তাঁর দেশকালের পরিবেষ্টন থেকে উপড়ে এনে অন্য যুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে বিচার করা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নব্য শিক্ষিত ইংরেজিনবীস ইয়ংবেঙ্গালের প্রাধান্য—যখন তথাকথিত শিক্ষিত

লোক বাংলা না-জানাকে গৌরবের বলে মনে করত। ইংরেজের গোলামিতে তখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি, নবজাগরণ আসেনি সমাজ মানসে। পাশ্চাত্য শিক্ষা সাহিত্য ও সংস্কৃতির বান ডেকেছে দেশে, জোয়ারের ঘোলা জল তখনো থিতিয়ে পড়েনি—বাঙালীর সমাজ ও দেশমানসে তখনো স্থিতিস্থাপকতা আসেনি। এই অস্থির চঞ্চল সমাজ মানসের চিন্তাধারায় বৃহত্তর ভাবধারা এসে পৌঁছয় নি। জাতি যখন বৃহত্তর ভাবধারার আলোকে স্নাত হয় তখনি সে জাতির পক্ষে মহত্তর সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। বোধ হয় এ-কারণেই ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কালের সাহিত্যে আমরা শাশ্বত রসাবেদন পাইনা, চিরায়ত কালের স্থায়ী সাহিত্য গড়ে উঠতে দেখি না। কিন্তু আগামী যুগের মহত্তর সৃষ্টি যে সাহিত্যের ভিত্তির উপর গড়ে উঠবে সে জমির প্রস্তুতির কাজ চলছিল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের পূর্ব পর্যন্ত। ঈশ্বর গুপ্তকে তাই আমরা প্রাচ্য পাশ্চাত্যের সংঘর্ষ যুগের কবি বলে অভিহিত করতে পারি। সেটা ভাঙার যুগ, পরিবর্তনের যুগ—বাংলা সাহিত্যে মানবমুখীন সমাজ-গড়ার কাজ ধরতে গেলে সুরু হল ঈশ্বর গুপ্তের পর থেকে।

সেকালে যাঁরা পাঁচালি, ছড়া, কবিগান, তরজা প্রভৃতি রচনা করতেন তাঁদের প্রধানত কবি-ওয়ালা বলে আখ্যাত করা হত। এই বৃহত্তর কবিওয়ালা গোষ্ঠীর উত্তরসাধক ঈশ্বর গুপ্ত। এঁদের রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য সাধারণগ্রাহ্য সহজ সরল প্রকাশভঙ্গী ও অকৃত্রিম বর্ণনা বাহুল্য। দেশের ঘোর দুর্যোগ মুহূর্তে শাসন ক্ষমতার অরাজকতার কালে কবিওয়ালা সম্প্রদায়ের আবির্ভাব। এই অরাজক বিশৃঙ্খলা ঈশ্বর গুপ্তের আমল পর্যন্ত বিস্তৃত। তাই সেকালের কবিওয়ালাদের গানে ও রচনায় যে ভাববিশুদ্ধির অভাব দেখা যায় সেজন্য যুগ পরিবেশ অনেক-খানি দায়ী। মানুষের রুচিও উন্নত ছিল না। তাই আধুনিক রুচি সম্মত শ্লীলতার সীমা রেখা সম্পর্কে কবিওয়ালারাও ততটা সচেতন ছিলেন না। বিকৃত রসের অশ্লীল বাক্‌পটুত্বও সাধারণের বাহবা পাওয়া খুব সহজ ছিল কবিওয়ালাদের পক্ষে। তাই ছিল তখনকার দিনের রেওয়াজ এবং তাই ছিল স্বাভাবিক। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রকাশরীতিতে এই কবিওয়ালা গোষ্ঠীর প্রভাব খুব স্পষ্ট। তিনি পূর্বসূরীদের অকৃত্রিম প্রকাশভঙ্গিকে গ্রহণ করলেন বটে কিন্তু তাঁর রচনার তীক্ষ্ন ব্যঙ্গ কটাক্ষ ও লঘু পরিহাস সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর গুপ্তীয়। এখানেই কবিওয়ালা গোষ্ঠী থেকে তাঁর পার্থক্য সূচিত করে এবং এখানেই ঈশ্বর গুপ্তের আধুনিকতা।

বাস্তব সচেতন সাহিত্য সৃষ্টি আধুনিক কালের সৃষ্টিকর্মের বৈশিষ্ট্য। প্রত্যক্ষ বস্তু নিয়ে, অতি সাধারণ বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে যে সাহিত্য সৃষ্টি রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গিমায় তা বিশেষ মর্যাদা পেয়ে চলেছে। সামান্য ঘটনা, নগণ্য জীবন, তুচ্ছ বিষয় বস্তুকে নিয়ে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে তা গত শতাব্দীর ঈশ্বর গুপ্তীয় রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টি-ভঙ্গিমার সার্থক প্রকাশ। কবিতার বিষয় বস্তু নির্বাচনে তিনি আনারস, এ্যাণ্ডাওয়ালা তপসা মাছ, পাঁটা প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় অথচ সংসারের তুচ্ছ জিনিসগুলিকে গ্রহণ করেছেন। এই অকিঞ্চিৎকর অথচ পরিচিত বিষয়বস্তু সর্বপ্রথম কাব্যে মর্যাদা পেল, সাহিত্যের কৌলীন্য অর্জন করল ঈশ্বর গুপ্তের হাতে। গুপ্ত কবির কবিত্ব সম্পর্কে তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুয়াঁয়, নাটুরে মালির ধুজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থিস্থিত মজ্জায়। তিনি আনারসে মধুর রস কাব্য রস পান, তপসে মাছে মৎস্যভাব ছাড়া তপস্বি-ভাব দেখেন।···স্থূল কথা, ঈশ্বর গুপ্ত রিয়েলিষ্ট এবং ঈশ্বর গুপ্ত স্যাটায়রিষ্ট, ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।' ভাবলে আশ্চর্য হতে হয় বাংলা সাহিত্যের আদি যুগে ঈশ্বর গুপ্তের রিয়ালিষ্টিক দৃষ্টিভঙ্গি

সাহিত্যের ভাবীযুগকে প্রত্যক্ষ করেছিল। হয়ত সেদিন তিনি বুঝেছিলেন সংসারের অতি সাধারণ জিনিসও তুচ্ছ নয়, সামান্য জিনিসেও মহত্তর সৃষ্টি সম্ভাবনা থেকে যেতে পারে—বাংলা সাহিত্যে বাস্তব সচেতনতা বিকাশের বীজ ঈশ্বর গুপ্তের মধ্যে প্রথম উপ্ত হয়েছিল। লঘু জিনিসে ভাবের গুরুত্ব আরোপ করা ও শেষে তত্ত্বে পৌঁছনো মহত্তর সাহিত্যের নিদর্শন সন্দেহ নেই—কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যের লঘু সুর কখনো লঘুত্ব হারায়নি বা গভীর হয়ে ওঠেনি। হালকা কথা তিনি হালকা ভাবেই বলেছেন এবং সেখানেই শেষ হয়ে গেছে—হয়ত মনের কোনে চিন্তার জটাজাল বিস্তার করে না বা পাঠককে ভাবিয়ে তোলে না। এখানেই গুপ্ত কবির বৈশিষ্ট্য। যদিও এ সকল কবিতা তাঁর শক্তিশালী কবি প্রতিভার পরিচয় বহন করে না কিংবা সূক্ষ্ম রস সৃষ্টির বিচারে সাহিত্যে উত্তরণ সম্ভব হয়নি; তবু আগামী যুগের দিকে যে শুভগুলি নির্দেশ করেছিল একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। Art is expression কে যদি আর্টের সংজ্ঞার্থে সুনির্দিষ্ট বলে ধরা যায় তা হলে ঈশ্বর গুপ্তের আর্ট কলাকুশলতায় প্রকাশের চাতুর্যে ও শব্দালঙ্কারে উজ্জ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রকাশের ভাষা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছিলেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায়, আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই তাহাতে সংস্কৃত জনিত বিকার নাই—ইংরেজি নবিশীর বিকার নাই। পাণ্ডিত্যের অভিমান নাই—বিশুদ্ধির বড়াই নাই। ভাষা হেলে না, টলে না—বাঁকে না—সরল সোজা পথে চলিয়া গিয়া পাঠকের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করে। এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গলা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহই লেখে নাই।'

—

দীর্ঘ বছরের ইংরেজ শাসনে ভারতবর্ষের পরাধীনতার জন্য বাংলা সাহিত্যের বিকাশে একটি সুর বিশেষভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছিল; সেটি দেশ জননীর শৃঙ্খল মুক্তির সুর। বাঙ্গালীর স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ সাহিত্যে রূপ লাভ করল। কবি রঙ্গলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল প্রভৃতির কবিতায় এই সুরটি তীব্র ভাবে ধ্বনিত হয়েছে — উদ্দেশ্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। কিন্তু তারো আগে ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় স্বাদেশিকতার সুর ধ্বনিত হয়েছিল। ইংরেজের শাসন তখন সবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, নীলকর সাহেবদের বর্বরোচিত অত্যাচার চলেছে গ্রামের নীলচাষী প্রজাদের উপর — ইংরেজ অনুগৃহীত নব্য শিক্ষিত বাঙালীর দৃঢ় প্রতিবাদ করার সংসাহস প্রায় ছিল না বললেই চলে। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের কবি চিত্ত তীব্র শ্লেষে বিদেশী শাসকদের অত্যাচারের স্বরূপ উদঘাটন করল — কবি মহারাণীর কাছে প্রার্থনা জানালেন :

'তুমি মা কল্পতরু, আমরা সব পোষা গরু;
শিখিনি শিং বাঁকানো,
কেবল খাব খোল বিচালি ঘাস
যেমন রাঙ্গা আমলা তুলে মামলা
গামলা ভাঙ্গে না,
আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না।'

বাঙ্গালী ও বাংলা ভাষার প্রতি নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালীদের অবহেলা কবিকে ব্যথিত করেছিল। একদিকে প্রাচীন পন্থী সংস্কৃত পণ্ডিতদিগের আধিপত্য অপরদিকে ইংরেজি নবিসদের মাতৃ-ভাষার প্রতি বিরূপভাব ঈশ্বর গুপ্তকে গভীর শ্লেষপূর্ণ কশাঘাতের আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। উল্লেখ করা যেতে পারে সাহেববাবুদের উদ্দেশ্যে লিখিত কবিতাটির ভগ্নাংশ :

'যখন আসবে শমন করবে দমন
বুঝি হুট বোলে, বুট পায় দিয়ে
কি বোলে তায় বুঝাইবে।
চুরুট ফুঁকে স্বর্গে যাবে ?'

কিংবা বাঙ্গালীর ছেলের ইংরেজ অনুকরণপ্রিয়তার একটি নমুনা —

'হয়ে হিঁদুর ছেলে ট্যাসে চেলে খেদ করে আর কে বোঝাবে।
টেবিল পেতে খানা খাবে। ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
এরা বেদ কোরাণের ভেদ মানে না জুতো পায়ে দেখতে পাবে।'

তিনি ব্যঙ্গ বিদ্রূপে বাঙ্গালীর নৈতিক ও মানসিক অবনতির স্বরূপটি চোখের সামনে উদ্ঘাটন করে মানস মুকুরে প্রতিবিম্বিত করতে চেয়েছিলেন — যাতে বাঙ্গালী নিজেকে সংশোধন করে নিতে পারে। উল্লেখ করা যেতে পারে স্নানযাত্রা কবিতায় মাহেশের স্নানযাত্রীর বর্ণনা, বাঙ্গালীর সাহেবিয়ানা অনুকরণ প্রিয়তা বিষয়ক কবিতা প্রভৃতি ঈশ্বর গুপ্তের জাতীয়তা ও স্বাদেশিকতার পরিচয় বহন করে। কবির দেশাত্মবোধ 'ভাষা' কবিতাটি রচনায় উদ্বুদ্ধ করে। কবি বড় আক্ষেপে লিখেছিলেন —

'হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ ।।

'মাতৃভাষা' কবিতায় কবি স্বদেশবাসীকে আহ্বান জানালেন :

'মাতৃসম মাতৃ ভাষা, পুরাবে তোমার আশা
তুমি তার সেবা কর সুখে ।।'

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সেবক ঈশ্বর গুপ্তের আহ্বানে বাঙ্গালী সাড়া দিয়েছিল। সেদিনের ক্ষীণ নদীর ধারা আজ কূলপ্লাবী হয়ে মহানদীতে পরিণত হয়েছে; বিশ্বসাহিত্যের রাজসভায় স্থায়ী আসন করে নিয়েছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। গুপ্ত কবির ব্যথিত হৃদয়ের আবেদন বৃথা যায় নি।

ঈশ্বর গুপ্তের পরবর্তী কালের উত্তরসাধকদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র অন্যতম। বাংলা সাহিত্যে এঁরা প্রত্যেকে স্বকীয় প্রতিভায় এক একটি উজ্জ্বল ভাস্কর বিশেষ। কিন্তু এঁদের মধ্যে কেউ ঈশ্বর গুপ্তের পথের পথিক নন। সাহিত্যে পুরোপুরি ঈশ্বর গুপ্তের ধারাকে কেউ বয়ে নিয়ে আসেননি। রঙ্গলাল প্রধানত ঐতিহাসিক কাব্য-কাহিনী রচনা করলেন। তাঁর রচনায় গুরুর সমাজ চেতনা ও জাতীয়তাবোধ প্রজ্বলিত হল। স্বাদেশিকতার জয়গান গাইলেন কবি, দেশমাতার বন্ধন মুক্তির গান শোনা গেল তাঁর কণ্ঠে :

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে,
কে বাঁচিতে চায়॥' (পদ্মিনী উপাখ্যান)

রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের জাতীয়তবোধ ও স্বদেশপ্রীতি প্রধানত ঈশ্বর গুপ্তের রচনা দ্বারা প্রভাবিত। কেননা, রঙ্গলালের বহুপূর্বেই ঈশ্বর গুপ্তের 'ভারত সন্তানের প্রতি' কবিতার মধ্যে স্বদেশপ্রীতি ও সমাজ চেতনা প্রকাশ পেয়েছে তা থেকে তাঁকে আমরা দেশ জাগৃতির প্রথম কবিরূপে আখ্যাত করতে পারি।

'পরাধীন ভারতের প্রিয়পুত্র যত। উঠ উঠ শয্যা ছাড় শুয়ে কেন আর
ভ্রান্তিরূপ নিদ্রাবশে রবে আর কত ।। বাহিরেতে কি হয়েছে দেখ একবার ।।'

কিংবা :

'ভ্রাতৃভাব ভাবিমনে, দেখি দেশবাসিগণে, কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি।
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া। বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ।।'

অনায়াসে বলা যায় ঈশ্বর গুপ্তের স্বদেশবাৎসল্য ও সমাজ প্রীতির ধারাকে কাব্যে বয়ে নিয়ে এলেন কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং সে ধারা অব্যাহত বয়ে চলল কবি মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথে, দ্বিজেন্দ্রলালে, সত্যেন্দ্র নাথ দত্তে, নজরুল ইসলামে এবং আরো আধুনিক কবিদের কবিতায়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রধানত উপন্যাসিক। বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের রাজপথ রচিত হল তাঁর হাতে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করলেন তিনি। 'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানী'তে, 'রাজসিংহে', 'দুর্গেশনন্দিনী'তে যে ইতিহাসের তিনি অনুসন্ধান করলেন তা শুধু বীরত্বের ইতিহাস নয়, স্বাদেশিকতার ইতিহাসও বটে। 'আনন্দমঠ' তাই দেশের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, গণজাগরণের প্রথম বাহিবাণ্ডি, দেশমাতৃকার বন্ধনমুক্তির প্রথম সাহিত্যিক প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে ঈশ্বর গুপ্তের রচনা রীতিকে গ্রহণ করেননি। তাঁর সাহিত্যচিন্তা ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্য ভাবনা থেকে অনেক মার্জিত ও স্বতন্ত্র — কী রচনারীতিতে কী প্রকাশের অভিব্যক্তিতে সন্দেহ নেই। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের দেশাত্মবোধ বঙ্কিমচন্দ্রকে উদ্বুদ্ধ করেনি, হৃদয়ে অঙ্কুর গেড়ে দেয়নি এ-কথা কে বলতে পারে। তাই মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' সেই স্বাদেশিকতার অভিব্যক্তি, 'আনন্দমঠ' তাঁর দেশ ও সমাজ চেতনার বলিষ্ঠ প্রকাশ।

দীনবন্ধু মিত্রে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব যথেষ্ট। যদিও ইনি গুরুর রচনারীতিকে যথাযথ গ্রহণ করেন নি। তবে ঈশ্বর গুপ্তের প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ ও কৌতুকবোধ দীনবন্ধু মিত্রকে প্রভাবিত করেছিল। তিনি প্রধানত নাটক ও প্রহসন রচনা করেন। 'নীলদর্পণ' তাঁর সার্থক সৃষ্টি। শুধু সার্থক সৃষ্টি নয় আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রহসন নাটক — যা তৎকালীন শাসকগোষ্ঠীর ভিত্ নাড়া দিয়ে তুলেছিল। নীলকুঠি সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী লিখে তিনি যে দুঃসাহস ও স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন তা বাংলা সাহিত্যে বিরল। কবি ঈশ্বর গুপ্তের দেশ ও সমাজপ্রীতির ধারা দীনবন্ধু মিত্রের প্রহসন নাটকে তা স্পষ্ট পরিস্ফুট হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্তের সাহিত্যিক আদর্শ ও স্বদেশ চেতনার প্রভাব বোধকরি সবচেয়ে বেশি কার্যকর হয়েছিল দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব অনস্বীকার্য।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত অপূর্ব শব্দকৌশলী কবি। তিনি প্রধানত শব্দালঙ্কারের কবি, ভাবালঙ্কারের নয়। সংস্কৃতের অনুষ্টুপ ছন্দ 'চর্যা', 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন' প্রভৃতিতে প্রাচীন পাদাকুলক ছন্দের রূপ নিল, পরবর্তীকালে মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' ও কাশীরাম দাসের 'মহাভারত' প্রভৃতিতে পয়ার ছন্দ গাঁথা হল। হরু ঠাকুর, এনটনি ফিরিঙ্গী, দাশরথি রায় প্রভৃতির হাতে এই পয়ারে শ্লেষ, যমক, অনুপ্রাস ও কাকুক্তির প্রাধান্য দেখা গেল। শব্দালঙ্কারের সুষ্ঠুপ্রয়োগে পয়ার ছন্দের নতুন প্রাণসঞ্চার করলেন ঈশ্বর গুপ্ত। রামায়ণের পয়ারকে তিনি আপন প্রতিভায় অধিকতর শক্তিমান ও বাস্তবধর্মী করে নিলেন — পয়ারের যে কত শক্তি তা তিনিই প্রথম দেখালেন। মধুসূদন এই পয়ারকেই রীতিগত আর একটি বৈশিষ্ট্য দান করে বহতা নদীর মত চঞ্চল ও প্রাণবান করে তুললেন। হেমচন্দ্র 'বৃত্রসংহার' কাব্যে মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরের অনুসরণ করেছেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে অমিত্রাক্ষর না হয়ে পয়ার হয়ে গেছে — এক্ষেত্রে ঈশ্বর গুপ্তকেই স্মরণ করতে হয়। নবীনচন্দ্র সেনে অমিত্রাক্ষর ও পয়ারের একত্র সমাবেশ ঘটেছে। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কাঞ্চীকাবেরী' ও দীনবন্ধু মিত্রের 'সুরধুনী' কাব্যে পয়ারের রঙ-ঢঙ-রীতি প্রভৃতি গুপ্ত কবির বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়। পরম প্রতিভাবান বঙ্কিমচন্দ্রের 'ললিতা' ও 'মানস' গুপ্ত কবির আঙ্গিকে লেখা। এ ছাড়া বরদা মিত্র, রাজকৃষ্ণ রায়, গিরীন্দ্র মোহিনীদাসী, কামিনী রায় প্রভৃতি বিখ্যাত কবিরা কাব্যে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব এড়াতে পেরেছেন বলে মনে হয় না। বাংলা সাহিত্যের বিকাশে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাব ভাবে, আদর্শে ও ছন্দে অনেকখানি কাজ করেছে — আগামী যুগের বিশ্বকবি-বন্দনার আগমনী ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যেই প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল, একথা কি ঐতিহাসিকরা স্বীকার করবেন না?

দিবা স্বপ্ন

সৈনিক-কবি এল. ই. এস্. কট্রেল

বাসনায় রাঙা স্বপনেতে বারে বার
দেখেছিনু আমি প্রান্তর-ভরা গমের ঘোড়-সোয়ার।
সারাদিন খেলে ক্লান্ত দ্বিপ্রহরে
বাতাস যখন আপনার মনে ঘুমায় ক্লান্তিভরে,
বিশ্রাম করে তখন পীতাভ গমের সৈন্যদল,
নীরবে বাতাস সঞ্চয় করে বল।

একটি বাতাস ঘোর অনিচ্ছাভরে
নাড়া দেয় সরু গাছদের মাথা ধরে।
প্রান্তর-পরে ঘুম-ভরা শ্বাস ফেলে,
কতগুলি গাছ সেই নিঃশ্বাসে হেলে।
মাথা নাড়ে তারা বায়ু-নিশ্বাস-তালে,
ছুঁয়ে যায় যবে চলিয়া যাবার কালে।

গ্রীষ্মের বায়ু বিকেলের শেষ-বেলা
আধ-ঘুমেভরা করে গুঞ্জন-খেলা।
এই রহস্য গর্ভিণী ধরণীর
তুলে নেয় ধ্বনি গাছগুলি অস্থির।
সেই ধ্বনিগুলি মিলে যায় এক সুরে,
প্রকৃতির ভাব বাজে নিকটে ও দূরে।

লক্ষ পালক নুয়ে পড়ে, ফুলে ওঠে,
ভেঙ্গে-পড়া ঢেউয়ে পালকের দল ছোটে।
নানা রূপ করি সৃষ্টি তাহারা ধায়,
বছরের পর বছর চলিয়া যায়।
প্রান্তর-ভরা ঈষৎ-হলদে গমের ঘোড়-সোয়ার,
স্বপনেতে আমি দেখেছিনু বারেবার।

উপেক্ষা

সৈনিক-কবি জুয়ান আল মে'ডর

মৃত্যু কুলটা, মায়াবিনী সে — উপেক্ষা করি তারে,
মোর সাথীদের ভুলাইয়া নিয়ে চলে গেছে মায়াবিনী।
সাথীরা আছিল জীবন-লীলার আনন্দে ভরপুর,
জীবন-লতিকা মৃত্তিকা হতে ছিঁড়ে নিল নিষ্ঠুরা।
সাথে যেতে যদি ইপ্সিত করে মৃত্যুর অঙ্গুলি,
প্রলুব্ধ করে সাথে যেতে মোরে নীরব-নম্র হয়ে,
খুশি-ভরা প্রাণে চলে যাবো আমি মৃত্যুর ইসারায়।
জানি আমি জানি বিনাশ বা ক্ষয় পারিবেনা মুছে দিতে
দীর্ঘ বছর উপহার দেছে যে মুহূর্তগুলি মোরে,
যে মুহূর্ত দিয়ে রচিয়াছি আমি সারাটা জীবন ধরে
অনুপম সুধা-লাবণ্যে-ভরা নিখুঁত একটি দিন।

আবার আসিবে ফিরে

সৈনিক-কবি সার্জেন্ট ডি. এল্. ডি

ফিস্ ফাস্ করে কথা বলে চলে দক্ষিণ সমীরণ,
বৃষ্টিতে-ধোয়া গোলাপ ফুলের গন্ধ ভাসিয়া আসে,
তার সাথে মেশা মিষ্টি-গন্ধ জ্বলন্ত স্মৃতিগুলি।
নদীতীর পথ, কুড়াতাম সেথা বসন্ত-শিহরণ,
চলে গেলো ত্বরা ডুবন্ত রবি স্বপ্নের আলো-জ্বালা,
আসিল গোধূলি সাথে নিয়ে কালো পাখীর কূজনধ্বনি।
তখন সময় ছিলো মধু-ভরা; গভীর প্রেমেতে ছিনু দোঁহে নিমগন।
সড়ক-দুয়ারে আগত যুদ্ধ — ভ্রূক্ষেপ করি নাই,
সাইন-বোর্ডেতে লেখা ছিল তার — যাতায়াত চলিবে না।
সেই পথ হতে দখিনা বাতাস তবু ধীরে ধীরে বলে—
সে বসন্ত-দিন আবার আনিবে আনন্দ-শিহরণ।

কবিতাগুলি মূল ইংরেজী হইতে। অনুবাদ ঃ **সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর**

বিংশ শতাব্দীর চেতনায় গণতন্ত্র

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

গণতন্ত্রের সংজ্ঞানির্ণয় করা যদিবা সহজ, তার স্বরূপনির্ণয় করা তত নয়। 'Government of the people, by the people and for the people কথাটা শুনতে মনোমত হতে পারে, কিন্তু কার্যত ধোঁয়াটে। মুস্কিল হল, গণতন্ত্রের নামে যত গগনভেদী চীৎকার ওঠে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা হয় রাজনৈতিক স্বার্থসম্ভূত, নয় অন্ধ আতঙ্কাশ্রিত। ফলে, গণতন্ত্রের ধারণা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যায়। আর একটা কথা আমরা মনে রাখিনা যে, যুগে যুগে প্রচলিত শব্দের অর্থবদল ঘটে, বিশেষত রাজনৈতিক ক্ষেত্রে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে 'লিবার্টি' অর্থে ফ্রান্সে ধর্ম-সাধনার স্বাধীনতাই বুঝিয়েছে, অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে তার অর্থ সম্পূর্ণ ভিন্ন। তেমনি গণতন্ত্রের ধারণাও বিভিন্ন কালে এবং সামাজিক পরিবেশে বিভিন্ন। এই কথাটা মনে রাখিনা বলেই অনেকের কাছেই গণতন্ত্রের ধারণা এখন উনবিংশ শতাব্দীতেই আটকে আছে বিংশ শতাব্দীতে এসে পৌঁছয় নি।

গ্রীক 'demos' (জনতা) এবং 'kratia' (ক্ষমতা—power) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে 'ডেমোক্রেসি শব্দের উদ্ভব। যে অর্থে 'ডেমোক্রেসি' প্রথমত ব্যবহৃত হত তার সঙ্গে একালের 'ডিক্টেটরশিপ অব দি পিপ্‌ল' কথাটি পরস্পর বিরোধী একথা বলা কঠিন। গ্রীক দার্শনিকদের শ্রেণীচেতনায় স্বভাবতই 'ডেমোক্রেসি' অবাঞ্ছনীয় বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। পরে যুগবদলের সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র বা 'ডেমোক্রেসি'র অর্থ ক্রমশঃ বদলে গেছে। যে শ্রেণীগত সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে এই অর্থ-বদল ঘটেছে তার বিশদ বিবরণ সম্ভবত অনেকেরই জানা, পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। আবার গত শতাব্দীর সামাজিক ঘাতপ্রতিঘাতের অভিজ্ঞতাতেই আবার গণতন্ত্রের সংজ্ঞার পুনর্নির্দ্ধারণ একালের সুধীসমাজের অন্যতম সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

আধুনিক যুগের চিন্তানায়কেরা প্রায় একমত যে শ্রেণীগত অর্থনৈতিক বৈষম্যের মধ্যে গণতন্ত্র অবাস্তব। পাশ্চাত্ত্যের তথাকথিত গণতন্ত্রকে তাই ম্যানহিম কখনো 'সুডো-ডেমোক্রেসি' কখনো বা 'কমার্শিয়াল-ডেমোক্রেসি' অর্থে সীমায়িত রেখেছেন; যথার্থ গণতন্ত্ররূপে স্বীকার করেন নি। লেনিন নির্মমভাবে এই 'গণতন্ত্রের' স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। যে ধারণায় ম্যানহিম পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রকে 'বেণে গণতন্ত্র' বলেছেন, সেই বিশ্লেষণেই ডিউই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে 'বেণে সভ্যতা' বলে অভিহিত করেছেন। ডিউই-র মতে এই 'বেণে সভ্যতা' মানুষের ব্যক্তিত্বকে বিশেষভাবে প্রতিহত করছে।[২] এই 'বেনে গণতন্ত্রের' ধ্বজাধারীরা গণতন্ত্রের সঙ্গে 'অবাধ কারবার'-কে সমার্থক করে ফেলার চেষ্টায় আছেন। এঁদের বক্তব্য নিয়ে অবশ্য মাথা ঘামাবার বিশেষ প্রয়োজন নেই। নেহেরু প্রায় এককথায় এঁদের বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন ঃ—
"There is no country in the world where free enterprize of his (Dr. Hamied's) dream exists. It does not exist even in the United States of America which is the high priest of free enterprize"[৩]

Laski, Tawney, Cole প্রভৃতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মুখে Walter Lippmann প্রমুখ 'অবাধ কারবার' বাদীদের বক্তব্য নিতান্তই হাস্যকর ঠেকে। মাসানির মতো বিভিন্ন দেশের নানা মুনির স্বার্থসম্বন্ধ প্রয়াস সত্ত্বেও তাই আজ একথা স্পষ্ট যে যতদিন অর্থ-

নৈতিক ক্ষমতা ধনিক গোষ্ঠীর কব্জায় থাকবে ততদিন যথার্থ গণতন্ত্র অসম্ভব। [১]

'অবাধ কারবার' বাদীদের বক্তব্য আমরা সরাসরি উড়িয়ে দিতে পারি। কিন্তু গত কয়েক শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এবং ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে গণতন্ত্রের যে কয়টি মূলসূত্রের সন্ধান আমরা পেয়েছি তা' হেলায় হারানো চলে না। যথার্থ গণতন্ত্রেও এই মূল সূত্রগুলি অপরিহার্য।

প্রথমতঃ গণতন্ত্র মানুষের মৌল সমতায় বিশ্বাসী। সব মানুষ যে দৈহিক বা মানসিক গুণে কিম্বা প্রবণতায় সমান তা নয়। কিন্তু জৈবিক ধর্মেই মানুষ অস্তিত্ব রক্ষা এবং আত্মবিকাশে প্রয়াসী, অথচ মানুষের অস্তিত্বরক্ষা এবং আত্মবিকাশ শুধুমাত্র সমাজবদ্ধতার মাধ্যমেই লভ্য। আর যেহেতু সমাজের অস্তিত্বের সঙ্গে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত অতএব সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা অর্থাৎ শাসনব্যবস্থার সঙ্গে প্রতিটি মানুষের স্বার্থ সমভাবে জড়িত। তাই গণতন্ত্রে এ বিশ্বাস অনিবার্য যে মতামতের প্রশ্নে সমস্ত মানুষের অধিকার সমান। এই মূলসূত্র স্বভাবতই দ্বিতীয় যে মূলসূত্রের পথিকৃৎ তা হল গণতন্ত্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের, তার স্বকীয় সত্তার স্বীকৃতি। আমার ধ্যান-ধারণা-বিচার-বিবেচনার যোগ্য প্রকাশক আমিই, অনেকের মধ্যে আমি এক হলেও আমার একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল বা জগৎ আছে এবং সেই জগতে আমি বিশিষ্ট। গণতন্ত্রে এই বৈশিষ্ট্যই স্বীকৃত। কিন্তু শুধু মানুষের সমতা এবং বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতির উপর ভিত্তি করে কোন শাসনব্যবস্থা বা সমাজ সংগঠন গড়ে উঠতে পারেনা। গণতন্ত্রের প্রথম এবং শেষকথা শাসনপ্রণালী,—গণআয়ত্ব শাসনব্যবস্থার উপায় নির্ধারণ। বর্তমানে এমন কোন রাষ্ট্র নেই যে-রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় সমস্ত 'প্রজা'র পক্ষে সরাসরি অংশ গ্রহণ সম্ভবপর। এ ক্ষেত্রে শাসক নির্বাচন অপরিহার্য। তাই গণতন্ত্রের তৃতীয় এবং সর্বপ্রধান মূলসূত্র প্রতিনিধি শাসক নির্বাচন ব্যবস্থা। আদিম গণসঙ্ঘ রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা সর্বদাই এক বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। প্রাক-গণতান্ত্রিক সমাজে এই শাসকদের উপর জনসাধারণের অধিকার অস্বীকৃত; গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রথার মাধ্যমে এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন রাষ্ট্রের নির্বাচনপ্রথার অসম্পূর্ণতা বা ত্রুটীর জন্য হয়ত কার্যত রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনসাধারণের অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে, কিন্তু সেজন্য এই মূলসূত্রটিকে অস্বীকার করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

এই মূলসূত্র তিনটিকে বাদ দিয়ে কোন গণতন্ত্রই 'গণতন্ত্র' হিসেবে স্বীকৃত হবে না, একথা সম্ভবত সকলেই মানেন। কিন্তু অভিজ্ঞতাসূত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই তিনটি মূলসূত্র বজায় রেখেও গণতন্ত্র অর্থহীন বাগ্‌বিলাসে পরিণত হয়। তাই গণতন্ত্রের সম্পূর্ণতা বা সার্থকতা অন্য একটি মূলসূত্রের সন্ধান সাপেক্ষ। কোথায় এই অসম্পূর্ণতা? গত কয়েক শতাব্দির অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত সুযোগের সাধারণীকরণ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মৌল সামান্য কার্যতঃ অস্বীকৃত। শ্রেণীপীড়িত সমাজে আজ এ তথ্য প্রকট যে সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থার চাবীকাঠি যতদিন সর্বসাধারণের হস্তগত না হয়, ততদিন পর্যন্ত গণতন্ত্র

১। cf. John Dewey 'Individualism—Old and New', New York, 1930, Chapter IV.

২। ১৯৫০ সালের ২৬শে ডিসেম্বর তারিখে নিউ দিল্লিতে 'ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ম্যানুফাক্‌চারারার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় শ্রীজওহরলাল নেহেরুর বক্তৃতা।

৩। "Economic forces tend to beget the political structure most suited to their purpose" (Harold J. Laski, 'Reflections on the Revolutions of one time. London, 1952, p. 310).

অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তাই সমাজতন্ত্রের প্রাথমিক প্রস্তুতি, উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ গণতন্ত্রেও অপরিহার্য। এই চতুর্থ মূলসূত্র বস্তুত গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের মধ্যবর্তী সেতু এবং এই সূত্রেই গণতন্ত্র সমাজতন্ত্রের পথিকৃৎ।

গণতন্ত্রের সঙ্গে উৎপাদনব্যবস্থার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের সম্বন্ধের কথা শুনে অনেকে আঁৎকে ওঠেন। Laisses faire মতবাদের কল্যাণে পরকীয় নিয়ন্ত্রণমাত্রই গণতন্ত্রবিরোধী এই ধারণা অধিকাংশের মনে বদ্ধমূল। সম্ভবত খুব কম লোকেই এ-তথ্যে সচেতন যে আজ পর্যন্ত অনিয়ন্ত্রিত সমাজ কুত্রাপি দেখা যায়নি। যেখানেই সমাজ থাকবে সেখানেই মানুষের উপর লিখিত বা অলিখিত নিয়ন্ত্রণ থাকতে বাধ্য। গণতন্ত্র ত সমাজের বাইরে স্থাপিত হবে না, কাজেই 'নিয়ন্ত্রণমুক্ত গণতন্ত্র স্বপ্নবিলাস (বা পাঠভেদে সুবিধাবাদী আওয়াজ) ছাড়া আর কিছু নয়। উৎপাদনব্যবস্থার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের সঙ্গে রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা মানুষের স্বভাবের অন্তর্গত। সামাজিকভাবে প্ল্যানিং না থাকার ফলেই সামাজিক অসাম্য টিকে আছে, [৪] কাজেই গণতন্ত্রের সঙ্গে প্ল্যানিং চলতে পারেনা এ-বিশ্বাস বিচারবোধের অভাবই প্রকট করে। রাষ্ট্রিক পরিকল্পনা অবশ্য বিভিন্ন দেশের সামাজিক—অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। তাই কোথাও বা প্রয়োজন 'প্ল্যানিং ফর্ ইউনিফিকেশন্' কোথাও বা প্রয়োজন 'প্ল্যানিং ফর্ ডিসেন্ট্রালাইজেশন্'। যাই হোক, উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্য, তেমনি পরিকল্পনা-বিহীন রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণও সম্পূর্ণ অর্থহীন এবং বস্তুত বিপজ্জনক।

গণতন্ত্রের উপরোক্ত চারটি মূলসূত্র ছাড়াও আরও কয়েকটি অপরিহার্য উপসূত্র আছে, যথা, অন্ধবিশ্বাস-বর্জিত বিচার-ভিত্তিকতা, পরমতসহিষ্ণুতা এবং জনশিক্ষার সাধারণীকরণ। এগুলি বহুল আলোচিত এবং সর্বজনগ্রাহ্য, তাই আলোচনার অপেক্ষা রাখেনা। কিন্তু গণতন্ত্রের আর একটি উপসূত্র আছে, ব্যক্তি-স্বাধীনতা বা 'ফ্রিডম্'। এই উপসূত্রটি উল্লিখিত দ্বিতীয় মূলসূত্রের সঙ্গে জড়িত। এই 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' বা 'ফ্রিডম' শব্দটিকে এমন ইচ্ছামত ব্যবহার করা হয় যে সাধারণের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আগেই বলা হয়েছে যে কোন সমাজেই মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকতে পারে না। 'ব্যক্তি-স্বাধীনতা' কথাটাকেও এই গণ্ডিতেই বিচার করতে হবে। কল্পনাবিলাসীরা 'ফ্রিডম্', 'লিবার্টি', 'ইকুয়ালিটি', প্রভৃতি গণতন্ত্রের সহচারী ধারণাগুলির উপর যে অর্থ আরোপ করেন, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় তা অচল। 'ফ্রিডম্' সম্পর্কে একটি মূল্যবান বৈজ্ঞানিক আলোচনায় Gerard Degre' বলছেন, "A sociological theory of freedom, therefore, must take as its starting point the 'socius', that is, the individual as a member of a group, class or social type, rather than the abstract individual-as-such that forms the nucleus of Romanticism" [৫]

বলা বাহুল্য এই মন্তব্য শুধু সমাজতত্ত্বই নয়, অন্যান্য সমাজ-বিজ্ঞানেও প্রযোজ্য। একই প্রবন্ধে Gerard Degre আরও বলছেন: "Freedom is determined by the degree to which persons distributively or collectively can play a course of action without arbitrary and unpredictable interference. The essence of freedom, therefore, is

৪। "An unplanned society means an unequal society...." (ibid., p. 325).

৫। cf. Gerard Degre, 'Freedom and Social Structure', 'American Sociological Review, October, 1946—reprinted in 'Sociological Analysis' Ed. by L. Wilson and W. L. Kolb, New York, 1949, p. 523.

its rationality in the sense that it is defined according to the predictability of the probable expectations tied up with a course of action. স্পষ্টতই ব্যক্তি স্বাধীনতার সঙ্গে গণতন্ত্রের চতুর্থ মূলসূত্রের কোন পরস্পর বিরোধিতা নেই।

মুক্তি বা 'লিবার্টি' সম্পর্কেও অধিকাংশ লোকের ধারণা নেতিবাচক—যে কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি। কিন্তু তা অবাস্তব। মুক্তি সত্তাবাচক। মুক্তি বলতে আমরা সেই পরিবেশই বুঝব যে পরিবেশে সামাজিক মানুষ তার পূর্ণ আত্মবিকাশের জন্য যথেষ্ট সমাজসংগত সুযোগ পায়। সাম্য কথাটিরও অপব্যবহার হয়েছে শুধুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটিকে সীমাবদ্ধ রেখে। কিন্তু একথা আজ আর প্রমাণের অপেক্ষা রাখেনা যে অর্থনৈতিক সাম্য (অর্থাৎ সুযোগ-সাম্য) না থাকলে রাজনৈতিক সাম্য অর্থহীন।

অনেকে 'ডেমোক্রেসির' সঙ্গে 'পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসিকে' একাকার করে ফেলেন প্রধানত এঁদেরই কণ্ঠপ্রাবল্যে জনসাধারণের মধ্যে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে দুনিয়াতে একমাত্র সাম্যবাদী দেশগুলিতেই গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটেছে, অন্যত্র গণতন্ত্র নিরঙ্কুশভাবে বিদ্যমান, কারণ সাম্যবাদী দেশগুলিতে 'পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসি' পরিত্যক্ত হয়েছে। সাম্যবাদী দেশগুলিতে আদর্শ গণতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে নিরপেক্ষভাবে একথা বলা চলেনা, কিন্তু পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র বজায় থাকলেই যে গণতন্ত্র সর্বাঙ্গিণতা লাভ করবে এমন কোন স্থিরতা নেই। যেমন ধরা যাক বৃটেন বা আমেরিকার কথা। এই দুটি দেশকে অধিকাংশ 'গণতান্ত্রিক'ই সবচেয়ে গণতান্ত্রিক দেশ বলে গণ্য করেন। এদের গণতন্ত্রের চেহারা কি?

Jennings Perry-র "Democracy Begins at Home" বইটি থেকে কয়েকটি চিত্তাকর্ষক তথ্য পাওয়া যায়। আমেরিকার টেনেসি রাজ্যে (এবং অন্যান্য রাজ্যেও) ভোটাধিকারের উপর একধরণের করধার্যের ফলে ক্রমশঃ ভোটদাতাদের সংখ্যা অত্যন্ত সংকুচিত হয়ে পড়েছে। যার ফলে ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মোট ১২,০০,০০০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে মাত্র ৩,৫২,০০০ জন ভোটার ভোট দিতে পেরেছে। ক্র্যাম্প নামে একজন ফাটকাবাজের হাতে ষাটহাজার ভোটনিন্ত্রিত হয়েছে।৬ এভাবে আমেরিকার 'গণতন্ত্রের স্বরূপ আরও অনেকেই উদ্ঘাটিত করেছেন। আমেরিকার নিগ্রো সম্প্রদায় এবং "Committee to Investigate Un-American Activities" নামক পরিষদের কার্যকলাপ মার্কিণী গণতন্ত্রের বিশিষ্ট সাক্ষ্য। লুণ্ডবার্গ-এর লেখা বই 'আমেরিকাস সিক্সটি ফ্যামিলি' পড়ে বুঝতে পারা যায় কেমন করে আমেরিকার 'গণতন্ত্র' পরিচালিত হয়। আর, এইচ্ টনি যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী তথ্য 'রিপোর্ট অব্ দি ইউনাইটেড ষ্টেট্স কমিশন অন্ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিলেশন' এর বিবরণের উপর নির্ভর করে দেখাচ্ছেন কিভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকজন ধনিক ("Corporations controlled by six financial groups") লক্ষ লক্ষ কর্মচারীর জীবনযাত্রা চূড়ান্ত এবং সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করছে।

বৃটিশ 'গণতন্ত্রের চেহারা কি? জোড্ লিখেছেন, যেহেতু বৃটেনের প্রতি নয়জন ব্যক্তির মধ্যে আটজনই ১৪ বছর বয়েসের পর আর শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায়না, অতএব সমাজকল্যাণে নিয়োজিত হতে পারত এমন প্রতি আটজনের সুপ্ত সম্ভাবনাকে গোড়াতেই অবহেলায় নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। কার্যত তাই বৃটেনে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমগ্র জনসংখ্যার মাত্র এক-নবমাংশ থেকেই নায়ক নির্বাচিত হচ্ছে।৭ টনি বলছেন বৃটেনের অধিকাংশ লোক অর্থনৈতিক সুযোগের বৈষম্যে পুরোপুরি নাগরিক অধিকার থেকে কার্যত বঞ্চিত।৮ এইভাবে ল্যাস্কি,

৬। cf. M. B. Mitin, "Soviet Democracy and Bourgeois Democracy" Moscow, p. 13.

রামসে ম্যুর, ষ্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ এবং আরও অনেকে বৃটিশ 'গণতন্ত্রে'র শোচনীয় অসম্পূর্ণতা উদ্ঘাটিত করেছেন। সমস্ত উদ্ধৃতি বা তথ্যের সমাবেশ আপাতত অপ্রয়োজনীয়। শুধু এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট যে, 'পার্লামেন্টারী সিষ্টেম' গণতন্ত্রের সর্বস্ব নয়, অথবা 'পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসি' বর্জন করলেই গণতন্ত্রের বিলোপ ঘটে একথা ঠিক নয়।

তবে একথাও মনে রাখতে হবে যে মুখে গণতন্ত্রের কথা বললেও কার্যত কোন সাম্যবাদী দেশেই গণতন্ত্র পরীক্ষিত হচ্ছে না। রাশিয়াতে যে সমাজব্যবস্থার পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তা' গণতন্ত্র নয়। হয়ত গণতন্ত্র রাশিয়ার আশু লক্ষ্যও নয়। অবস্থাবৈগুণ্যে গণতন্ত্রের পাশ কাটিয়ে রুশ গণসমাজ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় নিয়োজিত। এজন্য রুশ জনসাধারণকে অশেষ ত্যাগ এবং অবাঞ্ছনীয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে। কিন্তু একমাত্র রুশীয় পদ্ধতিই যে সব দেশে অনুসরণযোগ্য এই ভ্রান্তি কোন মার্কসবাদীই পোষণ করেন না। বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে অনেক দেশেই, বিশেষত ভারতবর্ষে বলপ্রয়োগ ভিন্নই রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করা সম্ভব। রাশিয়াতে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' (ডিক্টেটরশিপ্ অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্) প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণের একনায়কত্ব ('ডিক্টেটরশিপ্ অব্ দি পিপ্ল্) নয়। পরবর্তীকালে অবশ্য সর্বহারার একনায়কত্বের সঙ্গে 'জনসাধারণের একনায়কত্ব'কে একাকার করে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু লেনিনের 'টু ট্যাক্‌টিস্ অব্ সোস্যাল ডেমোক্রেসি ইন্ দি ডেমোক্র্যাটিক্ রেভোল্যুশন পুস্তিকাতে এই দুইটি কথার পার্থক্য স্পষ্টভাবেই নির্দিষ্ট। মার্কস বা এঙ্গেলসের কোন লেখাতেই 'ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্'কে 'class alliance' between the proletariat....and the numerous nonproletarian strata of working people" বলে চালাবার চেষ্টা করা হয়নি। একমাত্র 'সোস্যালিষ্ট রেভোল্যুশন'-এর পরই 'ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্'-এর প্রশ্ন ওঠে। 'ডেমোক্র্যাটিক্ রেভোল্যুশন' যে 'রেভোল্যুশন অব্ দি হোল পিপ্ল' সে বিষয়ে লেনিনের উক্তি খুব স্পষ্ট। ৯ লক্ষ্য করতে হবে "ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক"-এর উপর লেনিনের প্রাথমিক গুরুত্ব আরোপ পরে চাপা পড়ে গেছে। 'টু ট্যাকসিস্'-এ লেনিন বলছেন—

"Whoever wants to reach socialism by a different road, other than that of political democracy, will inevitably arrive at conclusions that are absurd and reactionary both in the economic and the political sense" (Moscow, 1950, p. 28).

১৯১৭ সালের পর কিন্তু "ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক"-এর পথ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার একমাত্র এবং অভ্রান্ত উপায় ("only possible way, along with only correct road") বলে লেনিনের কাছে মনে হয়নি। ১৯১৭ সালে রাশিয়ার পরিস্থিতি (the specific, historically very unique situation of 1917") লেনিনকে সম্পূর্ণ ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্ররোচিত করেছে। লেনিন এবং বলশেভিক পার্টী সরাসরিভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন অর্থাৎ 'ডিক্টেটরশিপ্ অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্' প্রতিষ্ঠিত হল। এই সিদ্ধান্ত রাশিয়ার আভ্যন্তরিক এবং আন্তর্জাতিক বিশেষ পরিস্থিতিতে সঠিক হয়েছে কিনা সে আলোচনা এখানে অবান্তর। আমাদের আলোচনায় শুধু এটুকু মনে রাখা দরকার যে 'ডিক্টেটরশিপ্ অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্' গণতন্ত্রের পর্যায়ভুক্ত নয়। গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের অংশ গ্রহণ (পার্টিসিপেশন

৭। C. E. M. Joad, 'The Principles of Parliamentary Democracy' London, 1949, p. 21. ৮। R. H. Tawney, 'Equality', London, 1951.

৯। "Two Tactics. .", Moscow, 1950, p. 124.

অব্ দি হোল পিপল্) আবশ্যক। অবশ্য 'সর্বহারার একনায়কত্ব' সাংগঠনিক প্রশ্নবর্জিত নয়। হয়ত এই সাংগঠনিক প্রশ্নেই 'পার্টি অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্' এত গুরুত্ব লাভ করেছে। কিন্তু 'ডিক্টেটরশিপ অব্ দি প্রোলেতারিয়েত্' কার্যত রূপান্তরিত হয়েছে 'ডিক্টেটরশিপ্ অব্ দি কম্যুনিস্ট পার্টীতে। মার্ক্স্‌বাদে কম্যুনিস্ট পার্টীর এই ভূমিকা অনেক পরবর্তী আমদানী।

কম্যুনিস্ট পার্টীর এই গুরুত্বলাভ সঙ্গত হয়েছে কিনা এ প্রশ্ন এযুগের এক বিরাট জিজ্ঞাসা। হতে পারে সর্বহারা শ্রেণীর সাংগঠনিক ঐক্যবন্ধন অত্যন্ত জটিল প্রশ্ন। একমাত্র বিশেষ পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতেই তাঁর আলোচনা সম্ভব। তবু একথা অনস্বীকার্য যে রাজনৈতিক সমাজ-সংগঠনের গণতান্ত্রিক পর্যায়ে একদলীয় একনায়কত্ব নিঃসন্দেহে বিপজ্জনক, এবং অন্যোপায় না হলে এই পন্থা গ্রহণের কোন প্রশ্নই ওঠে না। একদলীয় একনায়কত্ব যে ব্যক্তিগত একনায়কত্বে রূপান্তরিত হয়ে সমাজপ্রগতিকে অনেকটা বাধাহত করতে পারে তার শোচনীয় উদাহরণ আমরা পেয়েছি।

গণতন্ত্রের মূলসূত্র হিসেবে আমরা চারটি মূলসূত্রের সন্ধান পেয়েছি— (ক) মানুষের মৌল সামান্য এবং (খ) বৈশিষ্ট্যের স্বীকৃতি, (গ) প্রতিনিধি শাসক নির্বাচন, এবং (ঘ) উৎপাদন ব্যবস্থার রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণ তথা অর্থনৈতিক সুযোগের সাধারণীকরণ। পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা গণতন্ত্রের তৃতীয় মূলসূত্রের একটি বিশেষ পদ্ধতিমাত্র। তাই 'অবাধ-কারবার'-বাদের সঙ্গে যেমন গণতন্ত্রকে মিশিয়ে ফেলা চলে না, তেমনি পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের সঙ্গেও সার্থক গণতন্ত্রকে একাকার করে ফেলা সঙ্গত নয়। একাকার করে ফেলেছেন তাঁরাই, যাঁরা গণতন্ত্রকে বৃহত্তর সামাজিক এবং মানবিক পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে অপারগ হয়েছেন। তাঁরা মনে রাখেন না যে গণতন্ত্র মানুষের লক্ষ্য নয়, উপায় মাত্র। মানুষের সমস্ত সমাজব্যবস্থার মূলে আছে মানুষের অস্তিত্বরক্ষার তথা আত্মবিকাশের প্রয়াস। এই অস্তিত্বরক্ষার প্রয়াসেই মানুষ বিভিন্ন উপায়ের সদ্ব্যবহার করছে। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদেরা বলেন, স্বল্পসংখ্যক উপায়ের মধ্যে ব্যবহারোপযোগী উপায় নির্বাচনই মানুষের অর্থনীতি। এইভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার উপরই মানুষের সমাজব্যবস্থা পল্লবিত হয়েছে। আমরা দেখেছি যে একমাত্র সমাজব্যবস্থার মাধ্যমেই মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে। সমাজব্যবস্থা ত্রুটীপূর্ণ হলে মানুষের ব্যক্তিবিকাশ ও সেই পরিমাণে বাধাগ্রস্থ হয়। শ্রেণীপীড়িত সমাজে শ্রেণীকবলিত অর্থনৈতিক সুযোগের সাধারণীকরণই গণতন্ত্রের লক্ষ্য। কিন্তু অর্থনৈতিক সুযোগের সাধারণীকরণ এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার সাধারণীকরণ সমার্থক নয়। শ্রেণীবিভক্ত গণতন্ত্রে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ফলেই **সমস্ত মেহনতী** জনসাধারণের কর্তৃত্ব বলবৎ হয়; পরশ্রমভুক সামন্ত এবং ধনিক শ্রেণীর স্বার্থের প্রতিকূলে মেহনতী জনসাধারণের স্বার্থ অগ্রাধিকার পায়। এই অর্থেই যথার্থ গণতন্ত্রকে 'জনসাধারণের একনায়কত্ব' (ডিক্টেটরশিপ্ অব্ দি পিপ্‌ল্) বলা চলে। তবে বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র জনসাধারণের একনায়কত্ব মাত্র এই সংজ্ঞা একান্ত অসম্পূর্ণ। এই একনায়কত্ব বৃহত্তর মানবীয় স্বার্থে, সমস্ত মানুষের পূর্ণ আত্মবিকাশের সর্বাঙ্গিন সুযোগ-সাম্যলাভের জন্যই। তাই, মানুষের আত্মবিকাশের কথা উহ্য রাখলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সুতরাং বিংশ শতাব্দীর চেতনায় গণতন্ত্রকে একমাত্র এভাবেই বলা যায় যে, গণতন্ত্র এমন একটি সামাজিক তথা রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, যে-ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের অস্তিত্বরক্ষা এবং পূর্ণ আত্মবিকাশের সুযোগ-সাম্য প্রতিষ্ঠিত এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণব্যবস্থায় সর্বসাধারণের অধিকার সাম্যের ফলে জনসাধারণের বৃহত্তর স্বার্থ মুষ্টিমেয় শ্রেণীস্বার্থের প্রতিকূলে অগ্রাধিকার লাভ করে।

ডৈরোজীয়, রামমোহন ও বিপ্লব

যোগানন্দ দাস

ডৈরোজীয় বা ডিরোজিও-শিষ্যদের সম্বন্ধে যে-কথাটার সব চেয়ে বেশী প্রচার আছে সে-টা হল এই যে, ডৈরোজীয়রা ছিলেন বিপ্লবী এবং তাঁদের তুলনায় রামমোহন রায় ছিলেন আধা-বিপ্লবী বা নরমপন্থী 'সংস্কারক' মাত্র। কথাটা ভাসা-ভাসা, বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়।

আমরা জানি যে, পৃথিবীর যেখানে যেখানে বিপ্লব ঘটেছে, সেখানে সেখানেই রামমোহনের মনের গভীর যোগ ছিল। অর্থাৎ, রামমোহন সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক ঐতিহাসিক তথ্যগুলির প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রামমোহনের মনের গড়নটাই ছিল বিপ্লবী। সুতরাং সেই আলোকে, অর্থাৎ বিপ্লবের মাপকাঠিতেই রামমোহনের ও ডৈরোজীয়দের কর্মপন্থার তুলনামূলক বিচার দরকার।

তা করতে গেলে আগে দেখতে হবে, বিপ্লব কা'কে বলে। বিপ্লব বলতেই কি মারামারি রক্তারক্তি বোঝায়? একসময়ে হয়তো তাই-ই বোঝাতো। কিন্তু মার্ক্স্‌বাদের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের পরে এখন আর তা বোঝায় না। যে-দুটো উদাহরণ সাধারণত দেওয়া হয়—একটা জড়জগতের অন্যটা জীবজগতের—তাই দিয়েই শুরু করা যাক্।

প্রথম উদাহরণ, জড়জগৎ। জল থেকে বাষ্প। জলকে গরম করতে থাকলাম। জল ফুটন্ত উত্তাপে অর্থাৎ একশো ডিগ্রী তাপে গিয়ে পৌঁছলো। এই যে উত্তাপের পরিবর্তন,—শূন্য থেকে এক, এক থেকে পাঁচ, পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে বিশ, বিশ থেকে পঞ্চাশ একশো ডিগ্রী পর্যন্ত তাপের **ক্রমিক** বৃদ্ধি বা পরিবর্তন,— এ-টা হল একটা 'কোয়ান্‌টিটেটিভ্ চেঞ্জ' বা **পরিমাণগত** পরিবর্তন। জলটা আগাগোড়া জলই রয়ে গেল।

একশো ডিগ্রীতে পৌঁছবার পর কিন্তু জল এমন একটা অবস্থায় এল, যখন উত্তাপ আর বাড়লোনা বটে, কিন্তু জলটা হঠাৎ বাষ্পে পরিণত হতে আরম্ভ করল। জলটা আর জল রইল না। এই যে জল থেকে বাষ্পে পরিবর্তন, এ-টা হল 'কোয়ালিটেটিভ্ চেঞ্জ' বা **গুণগত** পরিবর্তন।

প্রথম পরিবর্তন, অর্থাৎ জল জল-অবস্থাতেই **ক্রমশ** উত্তাপ বাড়া এইটেই হ'ল ক্রম-বিবর্তন বা 'এভলিউশন্।' দ্বিতীয় পরিবর্তন, অর্থাৎ হঠাৎ জল থেকে বাষ্পে পরিণত, এইটেকে বলা হয়, বিপ্লব বা 'রেভলিউশন্'।

দ্বিতীয় উদাহরণ, জীবজগৎ। মায়ের পেটে ভ্রূণ বাড়ছে,—একদিন থেকে পাঁচ দিনের, পাঁচ দিন থেকে একমাসের, এক মাস থেকে দশমাসের হল। কিন্তু সব সময়েই একই ধারায় তার মায়ের সঙ্গে নাড়ীর যোগ রয়েছে, মায়ের রক্তসঞ্চালনের সঙ্গে তার রক্ত সঞ্চালনের, মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে তার শ্বাস প্রশ্বাসের একটা অবিচ্ছিন্ন অঙ্গাঙ্গী যোগ চলেছে। ভ্রূণ শুধু আয়তনে ও ওজনে বাড়ছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো কম থেকে বেশী পরিমাণে পুষ্ট হচ্ছে এবং **ক্রমশ** নিজের নিজের চেহারা নিচ্ছে। মায়ের পেটে ভ্রূণের এই যে ক্রমিক **পরিমাণ-গত** বৃদ্ধি এইটে হল বিবর্তন বা 'এভলিউশন্।'

তারপর হঠাৎ (অর্থাৎ দশমাসের তুলনায় অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে) সন্তান ভূমিষ্ঠ হল। ভ্রূণ আর ভ্রূণ রইল না, পরিপুষ্ট শিশু হ'ল। নাড়ী কাটা হ'ল, পুরণো জৈব যোগ বিচ্ছিন্ন

হ'ল। শ্বাস-প্রশ্বাস রক্তসঞ্চালন আর মায়ের একযোগে পূরণো ধারায় চল্‌লো না, একেবারে নতুন একটা নিজস্ব জৈব জীবনধারা শুরু হ'ল। চোখের সঙ্গে কানের সঙ্গে প্রত্যেকটা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাইরের জগতের প্রত্যক্ষ যোগ ঘটলো। মায়ের পেটের অন্ধ কুঠরী থেকে বাইরের খোলা জগতে এই যে জন্মগ্রহণ, ভ্রূণের জীবন থেকে নবজাত শিশুর জীবনের এই যে হঠাৎ বা অত্যন্ত সময়ের মধ্যে গুণগত পরিবর্তন, এইটে হ'ল বিপ্লব বা 'রেভলিউশন্‌'।

বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুধু গুণগতই নয়, পরিমাণগতও বটে। ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবটা 'বিপ্লব' কেন? তার মধ্যে কতটা মারামারি কাটাকাটি হয়েছে সেইটেই তার মাপকাঠি নয়। শিল্প-বিপ্লব যে 'বিপ্লব' তার প্রধান কারণ, সেটা একাধারে গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন। গুণগত, কেননা, হস্তচালিত শিল্প বাষ্পচালিত শিল্পে পরিণত হ'ল। পরিমাণগত, কেননা, এই পরিবর্তনের ফলে ঘন্টায় একজোড়া কাপড়ের বদলে নতুন ব্যবস্থায় পঞ্চাশজোড়া কাপড় তৈরী হ'ল।

॥ বিপ্লব ও সমন্বয় বা 'সিন্থেসিস' ॥

আর এক ভাবে এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন বা রূপান্তর নীতিকে মানব সমাজে আরোপ করলে আর একটি চেহারা সে নিতে পারে, আর একটি প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সে এগিয়ে চলে,—তার নাম, 'থিসিস্‌' —'এন্টিথিসিস্‌'—'সিন্থেসিস্‌'।

সমাজ একটা বাঁধাধরা গতানুগতিক ধারায় চল্‌ছে চিরাভ্যস্ত পূরণো পরিবেশে, তার সমস্ত পূরণো রীতি নীতি বিশ্বাস ও সংস্কার নিয়ে। সমাজের এই অবস্থাকে বলা যায় 'থিসিস' বা গতানুগতিক অবস্থা।

সেই গতানুগতিক সমাজ হঠাৎ একটা নতুন সমাজের সংস্পর্শে এল, সংঘর্ষে এল; নতুন পরিস্থিতির ও পরিবেশের সৃষ্টি হ'ল। এই পরিবর্তনের ফলে অনেক পূরণো রীতি নীতি সংস্কার অকেজো হয়ে পড়লো। নতুন রীতি নীতি নূতন বিশ্বাস নূতন সংস্কারের প্রয়োজন হল। কিন্তু পূরণো সংস্কারের পূরণো রীতিনীতির শেকড় চট্‌ করে কাট্‌তে চায় না। নতুনের দাবীকে চট্‌ করে মানতে চায় না। সুতরাং নতুন পরিবেশের মধ্যে স্রেফ্‌ বেঁচে থাকার তাগিদেই পূরণো সংস্কারের সঙ্গে নতুনের দাবীর দ্বন্দ্ব বাধে, সমাজের ভিতর থেকেই। এই দ্বিতীয় স্তর বা অবস্থাকে বলা যায়, সমাজের 'এন্টিথিসিস্‌' বা অন্তর্দ্বন্দ্ব।

গতানুগতিক সমাজটা যদি মরে না গিয়ে থাকে, তার মধ্যে যদি প্রাণশক্তি থেকে থাকে তবে, সেই 'এন্টিথিসিস্‌' বা অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে এমন সব প্রতিভার উদয় হয়, যাঁরা সমস্যার সমাধান করে দেন এমনভাবে যে, পূরণোর মধ্যেকার যে মূল জীবন-ধারা, সাংস্কৃতিক 'ভিত্তি', তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নতুনকে গ্রহণ করবার পথ পাওয়া যায় তার ফলে, সমাজের একটা রূপান্তর ঘটে, একটা গুণগত পরিবর্তন ঘটে, যে-টা হুবহু সাবেকী পূরণো গতানুগতিক সমাজের পুনরাবৃত্তি নয়, আবার বহিরাগত নতুন সমাজের সংস্কৃতির হুবহু নকলও নয়। এই তৃতীয় স্তর বা অবস্থার নাম 'সিন্থেসিস্‌' বা সমন্বয়, ভাষান্তরে, বিপ্লব। কারণ সিন্থেসিসের ফলে সমাজে যে-পরিবর্তন ঘটে, সে-টা গুণগত ও পরিমাণগত দুই-ই। তাকে বলা চলে, 'রি-ভ্যালুয়েশন্‌ অফ্‌ ভ্যালুজ' বা মূল্যায়ন।

'এন্টিথিসিস্‌' বিপ্লব নয়। 'এন্টিথিসিস্‌' একটা নেতিবাচক বা 'নেগেটিভ্‌' প্রক্রিয়া। 'সিন্থেসিস্‌' বা বিপ্লব হ'ল 'নেগেটিভ্‌' ও 'পজিটিভের' ঘাত-প্রতিঘাতে নতুন সৃষ্টি।

এই বারে দেখা যাক্‌, গত শতাব্দীতে ভারতীয় তথা বাঙালী সমাজে কি ধরণের পরিবর্তন ঘটেছিল এবং সেই পরিবর্তন সাধনে রামমোহনী ধারা ও ডৈরোজীয় ধারা, কে কোন্‌ ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

॥ ইংরেজ আমলে প্রথম 'এন্টিথিসিস' বা অন্তর্দ্বন্দ্ব ॥

ইংরেজ আমলে একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়। দু'টো সম্পূর্ণ আলাদা ও ভিন্ন প্রকৃতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংঘর্ষ শুরু হয় এই বাংলা দেশের জমিতে। পাঁচমিশেলী বাংলার সংস্কৃতির সঙ্গে পাঁচমিশেলী ব্রিটিশ সংস্কৃতি প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে এল। ফলে, পরিস্থিতি ও পরিবেশের বদল ঘটল এবং অবশ্যম্ভাবী রূপে সমাজের সর্ব ক্ষেত্রে 'এন্টিথিসিস্‌' বা পূরণো-নতুনে অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দিল,—আচার-ব্যবহারে, শিক্ষায়, সাহিত্যে, অর্থনীতিতে, রাষ্ট্রনীতিতে, ধর্মে।

ক। পূরণো সংস্কার অনুসারে অব্রাহ্মণকে—ম্লেচ্ছকে তো দূরের কথা—শাস্ত্র পড়ানো ব্রাহ্মণের পক্ষে নিষিদ্ধ। কিন্তু ম্লেচ্ছ 'সাহেবলোকেরা' ব্রাহ্মণকে হুকুম করলেন, 'শাস্ত্র পড়াতে হবে'। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অন্তরস্থ ডাঃ জেকিল বল্‌লে, শাস্ত্র পড়িও না, কারণ ও-টা সংস্কার-বিরুদ্ধ, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কাজ। কিন্তু সেই সংস্কার-চালিত ব্রাহ্মণেরই মধ্যেকার মিঃ হাইড্‌ বল্‌লে, বোকামি কোরো না, পড়াও, টাকা পাবে চাকরি পাবে প্রতিপত্তি হবে। নতুনের দাবী মানতে হল, গোঁড়া ব্রাহ্মণকে শাস্ত্র-বিরোধী কাজ করতে হল। পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় ম্লেচ্ছকে বাংলা পড়ালেন আবার সেই বাংলা ভাষায় বেদান্ত অনুবাদের জন্য রামমোহনকে গালিও দিলেন। এই যে এন্টিথিসিস, রামমোহন সে-টা তাঁর গ্রন্থাবলীতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন।

খ। নতুন পরিস্থিতি বল্‌লে যে, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কায়স্থ সমস্ত উচ্চবর্ণের হিন্দুকে ম্লেচ্ছ ইংরেজের সঙ্গে স্বার্থের খাতিরে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতে হবে, তাতে জাত থাকুক আর যাক্‌। পূরণো সংস্কার বল্‌লে, তা চল্‌তে পারে না, জাত যাবে। নতুন-পূরণোয় রফা হল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা ফোর্ট উইলিয়ম্‌ কলেজে বা অন্যত্র ম্লেচ্ছ ইংরেজকে বিদ্যাদান করে বা অন্যভাবে তাদের সংস্রবে এসে প্রতিদিন যে 'পাপ' করতেন প্রতিদিন বাড়ী ফিরে একটা যেমন-তেমন 'প্রায়শ্চিত্ত' করে শুদ্ধ হয়ে অন্দরে ঢুকতেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, ধর্মসভার এবং 'সদাচারের' একজন মস্তবড় পাণ্ডা। চৌকিদারি (শূদ্রের বৃত্তি) নিয়ে ভৃত্যদের (মিনিয়্যাল্‌স্‌) প্যারেড্‌-এ দাঁড়িয়ে, ব্রাহ্মণ হয়ে ম্লেচ্ছ ইংরেজ প্রভুকে সেলাম ঠুকলেন, এবং ম্লেচ্ছ ভাষায় দু'টো কথা বলে নিজের বিদ্যার পরিচয় দিয়ে ধন্য হলেন। আবার ধর্মসভায় গিয়ে রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে "সদাচার" রক্ষায় কোমর বাঁধলেন, রামমোহনের দলকে একঘরে করবার চেষ্টা করলেন।

গ। জাত বিচারের পূরণো নিয়ম-কানুন পূরণো সংস্কার বল্‌লে, জেলের ছেলেকে মাছ ধরতে হবে, তাঁতির ছেলেকে তাঁত বুনতে হবে, কলুর ছেলেকে ঘানি টান্‌তে হবে। যার যে জাত, তার সেই বৃত্তি বা পেশা। নতুন পরিস্থিতি বললে, ও-সব চল্‌বে না। যে-কোন জাতে যে-কোন পেশা নেবে, তা' দিয়ে যদি তার ও সমাজের লাভ হয়। রামমোহনের 'সংবাদকৌমুদী' কথাটা প্রথম বল্‌ল। জাতে ও পেশায় পূরণো-নতুনে লড়াই (অন্তর্দ্বন্দ্ব বা এন্টিথিসিস্‌) বাধল। ব্রাহ্মণ ভবানীচরণ চৌকিদার হলেন, অনেক 'সদ্‌' ব্রাহ্মণ ম্লেচ্ছ সাহেবলোকেদের বা সাহেব কোম্পানীর মুচ্ছুদ্দি হলেন, বেনিয়ান হলেন বা বানিয়াগিরি পেশা ধরলেন। কিন্তু মুখে ও সমাজে জাতিভেদ চল্‌লো, "সদাচারের" প্রোপ্যাগ্যাণ্ডা চললো।

ঘ। পূরণো ব্যবস্থা পূরণো সংস্কার বল্‌লে, সাবেকী পণ্ডিতানি সংস্কৃতানি বিদ্যা চালাও। টুলো ব্যবস্থা চলুক, 'তৈলাধারপাত্রম্‌'-না-'পাত্রাধারতৈলম্‌'-এর চুলচেরা বিচার অব্যাহত থাকুক। নতুন পরিস্থিতি বল্‌লে কেজো বা দরকারী ("ইউজ্‌ফুল") বিদ্যা ও বিজ্ঞান শেখাতে হবে যাতে করে আজকের এই 'পরিবর্তিত' পরিবেশে মানুষ জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে পারে। সব প্রথম রাম-

মোহন বড়লাটকে লেখা চিঠিতে নতুনের এই দাবী জানালেন। শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরণো-নতুনের এন্টিথিসিস বা অন্তর্দ্বন্দ্ব চল্‌লো।

ঙ। ফিউড্যাল্‌—বুর্জোয়া—সমাজতন্ত্র—সাম্যবাদ, এই হল অগ্রগতির ঐতিহাসিক পথ। সুতরাং ফিউড্যাল্‌ থেকে বুর্জোয়া (উনিশ শতক) হল সামনেএগুনো, পিছু-হটা নয়। নতুন যুগ যখন প্রথম এদেশে এল, তখন পুরোদমে চলছে সাবেকী সামন্ত-শাসন। ফিউড্যাল্‌ রাজা ও সর্দাররা নিজেদের ব্যক্তিগত বা বংশগত ("ড্যাইনাস্টিক্‌") স্বার্থের জন্য রাজ্য চালাচ্ছে, লড়াই করছে, এ-ওর মাথা কাটছে,—প্রজার দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। রাজায় রাজায় লড়াই হয়, উলুখড়ের প্রাণ যায়। প্রজার কোনো 'সত্তা' নেই, কারণ, রাজ্যশাসনে তার কোনো মতামত নেই। নতুনের দাবী,—মূক প্রজার মুখর হওয়া, দাবী জানানো, রাজার জগদ্দল চাপের তলা থেকে প্রজার সত্ত্ব ও সত্তা গড়ে তোলা, —রাজ্য থেকে প্রাজ্য। মূকের মুখর হওয়ার, দল বাঁধার দাবী জানানোর পথ বাংলালেন রামমোহন 'সংবাদকৌমুদী' 'মিরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' চারটে ভাষায় 'বঙ্গদূত' বার করে, দল বেঁধে আরজি পেশ করে, সভা সমিতি করে, 'এজিটেশন্‌'-এর ভিত্তি পত্তন করল। দ্বন্দ্ব শুরু হল রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ সামন্ত স্বার্থে আর সদ্যমুখর বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থে।

চ। পুরণো ব্যবস্থায় বাদ্‌শা নবাব থেকে সামান্য জমিদার পর্যন্ত 'গুলামি' বা ক্রীতদাস প্রথা। চাষীরা থাকে গুলামের মতোই। সামন্ততান্ত্রিক দণ্ড-মুণ্ডের কর্তা জমিদারের অত্যাচার সয় গুলামের মতোই। নতুন ব্যবস্থায় নীলকর সাহেবরা নিয়ে এল চুক্তি-বদ্ধ মজুরির প্রথা। পুরণো অবস্থার তুলনায় চাষীরা কিছুটা মুক্তি পেল। দ্বন্দ্ব লাগল অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুরণো আর নতুনে, সামন্ততান্ত্রিক গুলামি-শ্রমে ও বুর্জোয়া-তান্ত্রিক চুক্তিবদ্ধ-শ্রমে। রামমোহন বিলিতি সাহেবদের এদেশে উপনিবেশের সমর্থন করলেন। স্বেচ্ছাচারী **সামন্ততান্ত্রিক জমিদারের** হাত থেকে চাষীদের মুক্তি লাভের আশায়।

॥ যুগ-পরিবর্তনে যুব আন্দোলনের সাড়া ॥

যখন নবাগত সংস্কৃতির সংঘাতে পুরণো ধারার বস্তাপচা অনেক রীতি নীতি অকেজো হয়ে পড়লো, অথচ পুরণো সমাজ শুধু সনাতনের মোহেই তাকে আঁকড়ে থাকতে চাইলো, সেই সময়ে নতুনের ডাকে সাড়া দিল দুটো দল দুই ভাবে,—প্রথমটি রামমোহনের, দ্বিতীয়টি ডিরোজিওর। দু'জনেরই আন্দোলন যুব-আন্দোলন।

সাধারণত এদেশে ডৈরোজীয় আন্দোলনকেই প্রথম যুব-আন্দোলন ("ইয়ং বেঙ্গল্‌") হিসেবে ধরা হয়। কিন্তু যখন উনিশে শতাব্দীর **সর্বপ্রথম** সমাজ-সংস্কার আন্দোলন—**সতীদাহ নিবারণ**—শুরু হয়, সে-সময়ে রামমোহন-শিষ্যদের বয়সের হিসেব কেউ করেন না।

যখন সহমরণের বিরুদ্ধে রামমোহনের প্রথম বই বেরোয় এবং আন্দোলন শুরু হয়ে ক্রমেই তীব্র হতে তীব্রতর হতে থাকে (যে-আন্দোলনের তীব্রতার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের কোনো তুলনা হয় না); যে আন্দোলনের ফলে রামমোহনকে ব্যঙ্গ করে কবিতা লেখা হয়েছে; যে আন্দোলনের ফলে রামমোহনের দলকে-দলের উপর "সতীদ্বেষী" ছাপ মেরে একঘরে করবার চেষ্টা হয়েছে এবং যে এই 'সতীদ্বেষী'দের সঙ্গে আহার-বিহার করেছে তাকেই সমাজচ্যুত করা হয়েছে; যে-আন্দোলনের ফলে রামমোহন রায়ের জীবনের উপর দু-দুবার আক্রমণ হয়েছে যার জন্য রামমোহনকে বাইরে বেরুতে গেলে সশস্ত্র অবস্থায় বেরুতে হত এবং যার জন্য রামমোহনের বন্ধু মন্টগোমারি মার্টিনকে রামমোহনের বাড়ীতে বন্দুক, গোলাবারুদ, ছোরা ও বরকন্দাজ আমদানী করে ঐ বাড়ী পাহারা দিতে হয়েছে; এবং যে আন্দোলনের জের বিলেত পর্যন্ত পৌঁছেছিল ও যাকে পূর্ণ সাফল্য দেবার জন্য রামমোহনকে বিলেত পর্যন্ত দৌড়তে

হয়েছিল,—সেই সহমরণ বিষয়ে প্রথম বই প্রকাশ কালে, ১৮১৮ সালে, রামমোহনের বয়স ৪৬; রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ৩৩, দ্বারকানাথ ঠাকুরের ২৪, রামনাথ ঠাকুরের ১৮, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ১৭, রাজনারায়ণ বসুর বাপ নন্দকিশোর বসুর ১৬, আর (পরবর্তীকালে ব্রাহ্মসমাজের প্রথম সম্পাদক) তারাচাঁদ চক্রবর্তীর বয়স ১৪।

সুতরাং দেখা যায়, বাংলা দেশে, ডিরোজিওর আগে **রামমোহন রায়ই প্রথম যুব-নেতা।** রামমোহনের 'বিরাদর'রা প্রায় সবাই যুবক।

॥ 'ইয়ং বেঙ্গলের' নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী ॥

একটা কথা এখানে লক্ষ্য করবার আছে। রামমোহন রায় ও ডিরোজিও মৃত্যুর পর ডিরোজিওর শিষ্যদল তাঁদের নেতা হিসেবে বরণ করলেন কাকে?—রামমোহন-শিষ্য, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে, যিনি একদিনের জন্যও ডিরোজিওর কাছে পড়েন নি, ডিরোজিওর কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পান নি।

১৮৩৮, ১২ মার্চ তারিখে সংস্কৃত কলেজ হল্‌-এ তিনশোর বেশী যুবক —'ইয়ং বেঙ্গল্‌' —সভা করে 'সোসাইটি ফর্‌ দি অ্যাকুইজিশন্‌ অফ্‌ জেনারেল্‌ নলেজ' (সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা) স্থাপন করলেন এবং ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি করলেন তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে।

১৮৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংস্কৃত কলেজ গৃহে যখন ঐ তারাচাঁদের সভাপতিত্বে জ্ঞানোপার্জিকা সভার একটি অধিবেশন হয় এবং দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় একটি বক্তৃতায় কোম্পানীর পুলিশ প্রভৃতির সমালোচনা করছিলেন, তখন বক্তৃতার মাঝখানে অভদ্রভাবে হঠাৎ বাধা দিয়ে ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন্‌ উঠে বল্‌লেন, 'এ হল রাজদ্রোহ ('ট্রীজন্‌')। এ ভাবে বক্তৃতা দিলে এ-সভার জন্য কলেজ-ঘরের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

যে-রামমোহনকে নবাগত বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের এডিকং "বড়লাট **লর্ড** বেন্টিঙ্ক বাহাদুরের" সেলাম জানিয়ে দেখা করতে বলায় রামমোহন পাল্টা সেলাম জানিয়ে তাকে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন দেখা করেন নি, এবং তার জন্য লর্ড বেন্টিঙ্ককে ফিরে বিনীত "অনুরোধ" জানাতে হয়েছিল যে, 'রামমোহন রায় যদি **মিস্টার** বেন্টিঙ্কের সঙ্গে দেখা করেন তবে মিস্টার বেন্টিঙ্ক বাধিত হবেন এবং যে-রামমোহন সেই ভদ্রলোক মিঃ বেন্টিঙ্কের (বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের নয়) "অনুরোধ" রেখেছিলেন; যে-রামমোহন নিজের কাগজ 'মিরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার্‌' বন্ধ করে দিয়েছিলেন তবু নতি স্বীকার করেন নি; যে-রামমোহন নেপ্‌ল্‌সের বিপ্লবীদের পরাজয়ে বলেছিলেন, 'তাদের সাধনা আমার সাধনা, তাদের শত্রু আমার শত্রু', সেই বিপ্লবী রামমোহন রায়ের বিপ্লবী শিষ্য, যুব-বাংলার নেতা, সভাপতি তারাচাঁদ তৎক্ষণাৎ উঠে ক্যাপ্টেন্‌ রিচার্ড্‌সনকে সতেজে বাধা দিয়ে বললেন, 'ক্যাপ্টেন্‌ রিচার্ড্‌সন্‌, আপনার এই ধরণের আচরণ আর বেশী দূর এগুতে দিতে পারি না। আপনার কথা আপনি এখনি প্রত্যাহার করুন, তা নইলে এই বিষয়টি আমি কলেজ-কর্তৃপক্ষের কাছে এবং প্রয়োজন বোধ করলে গবর্ণমেন্টের কাছে রিপোর্ট করবো।'

এ তারাচাঁদ চক্রবর্তী রামমোহনের শিষ্য। ব্রহ্মসমাজের সম্পাদক,—ডিরোজিওর ছাত্র নন। এবং এই তারাচাঁদের নামেই ডৈরোজীয়রা— 'ইয়ং বেঙ্গল্‌'—পরিচিত হয়েছিল "চক্রবর্তী ফ্যাক্‌শান্‌" নামে।

॥ 'ইয়ং বেঙ্গল' ও তত্ত্ববোধিনী সভা ॥

জ্ঞানোপার্জিকা সভা প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে, ১৮৩৯ সালের ২১শে অক্টোবর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের নেতৃত্বে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রতিষ্ঠিত হল। পরে এর নেতা হলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং এর সভ্য হলেন বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে সাতশোর ওপর। এঁদেরও বেশীর

ভাগ সভ্যের বয়স ১৮ থেকে ত্রিশের মধ্যে অর্থাৎ, আত্মীয় সভা, অ্যাকাডেমিক্ এসোসিয়েশন, সর্বতত্ত্বদীপিকা, জ্ঞানোপার্জিকা সভার মতো তত্ত্ববোধিনী সভাও অন্যতম—শুধু অন্যতম নয় সেযুগের বৃহত্তম—যুব-প্রতিষ্ঠান।

তত্ত্ববোধিনী সভার সরকারী রিপোর্টে সম্পাদক বল্‌ছেন যে, রামমোহন রায়ের "ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রদীপ্ত করিবার মানসে" তত্ত্ববোধিনী সভা প্রতিষ্ঠা করা হল এবং "এদেশের কাল্পনিক ধর্ম্ম নিরাকরণ পূর্বক বিস্তাররূপে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করাই এ সভার সঙ্কল্প।" তেজস্বী যুবক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র এর অন্যতম বিশিষ্ট সভ্য ও পরে সম্পাদক।

'ইয়ং বেঙ্গল' দলের নেতা তারাচাঁদ চক্রবর্তী এই দলে যোগ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায়, এই "ব্রাহ্মধর্ম" প্রচারক তত্ত্ববোধিনী সভার সভ্য হলেন—জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ডিরোজিওর যে পনেরো জন প্রধান ছাত্রের নামে বিদ্রূপ করে সংস্কৃতে ছড়া বেঁধেছিলেন তাঁদের মধ্যে অর্ধেকেরও বেশী,—দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রাধানাথ শিকদার, হরচন্দ্র ঘোষ, রামতনু লাহিড়ী, শিবচন্দ্র দেব, চন্দ্রশেখর দেব।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, একদিকে যেমন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার, পণ্ডিত বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতি পণ্ডিতের দল, তেমনি অন্যদিকে 'ইয়ং বেঙ্গল —তথাকথিত "নাস্তিক" ডিরোজিওর বেশীর ভাগ প্রধান প্রধান "বিপ্লবী" শিষ্য ও হিন্দু কলেজের অন্যান্য বহু ছাত্র, যেমন, কাশীপ্রসাদ ঘোষ, দিগম্বর মিত্র, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি—তাঁদের পথ খুঁজে পেলেন শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মনেতা যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের" "ব্রাহ্মধর্ম্ম" প্রচারক তত্ত্ববোধিনী সভার মধ্যে। এই 'ইয়ং বেঙ্গল' ও তত্ত্ববোধিনী সভার যোগাযোগের মধ্যেই নিহিত আছে রামমোহনী পন্থা ও ডৈরোজীয় পন্থার বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য।

॥ সমাজতন্ত্র, সমাজ-বিজ্ঞান ও ব্রাহ্মসমাজ ॥

আধুনিক ইতিহাস শাস্ত্র, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ, ও সমাজ-বিজ্ঞানের দিক থেকে ব্রাহ্মসমাজ, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও তত্ত্ববোধিনী সভার ঐতিহাসিক তাৎপর্যের এখনো কোনো বিশেষ আলোচনা হয়নি। সেই জন্যই অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের, বিশেষ করে বাংলা দেশের উনিশে শতাব্দীর ইতিহাস একপেশে হয়, অনেকটা কাল্পনিক হয়, বাস্তব হয় না।

এই আলোচনা না হবার প্রধান কারণ দুটি। প্রথমটি হল : গত শতাব্দীর সাতই-আটই শতক থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে ব্রাহ্ম আন্দোলন ব্রিটিশ বণিক-স্বার্থের ও ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের পরিপন্থী রূপ গ্রহণ করতে থাকায় ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক দেশ থেকে এই আন্দোলনকে বিচ্ছিন্ন করে দেবার চেষ্টা. পাশ্চাত্ত্য দেশ থেকে আমদানী-করা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মান্দোলনের ও টাকার সাহায্যে এদেশের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় ও সামাজিক শক্তিগুলির পুনরুজ্জীবন ও পরিপুষ্টি সাধন ('রিভাইভ্যালিজম্') প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ রাজকর্মচারী ও অন্যান্য মার্কিণী-ইংরেজ কর্তৃক এদেশে প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারার পৃষ্ঠপোষণ; এবং এই সব কারণে এ-দেশের লোকের মনে ক্রমশ ব্রাহ্ম-'ধর্মের' প্রতি বিরূপতার সৃষ্টি ও বৃদ্ধি। এই ধারা ইংরেজ আমলের শেষ পর্যন্ত চলেছে এবং বর্তমান শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে খুব বেড়েছিল।

দ্বিতীয় কারণ : তত্ত্বগত সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদের দিক থেকে 'ধর্ম' বিষয়টির প্রতিই বিরূপতা। অর্থাৎ, সামাজিক অগ্রগতির মূলে অর্থনৈতিক প্রভাবের ব্যাপক ও একান্ত প্রাধান্য স্বীকৃত হওয়ার জন্য এবং 'ধর্মের' সাংস্কৃতিক মূল্য একেবারে অস্বীকৃত হওয়ার জন্যও জাতি-

গঠনে ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহাসিক ভূমিকা একেবারে উপেক্ষিত হয়েছে; কারণ, ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে 'ধর্মের' সম্বন্ধ রয়েছে।

বিষয়টি বিস্তৃত, বর্তমানে প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। কিন্তু যখন দেখা যাচ্ছে যে, সরকারী ভাবে ধর্ম-সম্পর্ক-শূন্য হিন্দু কলেজের প্রধান প্রধান ছাত্ররা, এমন কি ডিরোজিওর শিষ্যরাও, হয় ক্রীশ্চান হয়ে যাচ্ছেন নয়তো ব্রাহ্ম'ধর্ম' সম্পর্কিত তত্ত্ববোধিনী সভায় যোগ দিচ্ছেন, তখন এখানে 'ধর্ম' বিষয়ে কিছু আলোচনা না করলে ডৈরোজীয় পন্থার ঐতিহাসিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে না।

॥ ইতিহাসে তত্ত্ব ও তথ্য ॥

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞানের দু'টো পা, একটি তথ্য বা 'ডেটা,' অন্যটি তত্ত্ব বা 'থিওরি'। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদেরও তাই। বাস্তব তথ্যকে বাদ দিয়ে যে-তত্ত্ব, তার ঐতিহাসিক, সমাজতান্ত্রিক অথবা সমাজ-বৈজ্ঞানিক, কোনো মূল্য নেই। সাম্যবাদেও সেই জন্যই দেখা যায়, আগেকার তথ্যের উপর যে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয়েছে, ঐতিহাসিক পরিবেশের ও সমাজের বদলের জন্য পরবর্তী নতুন বাস্তব তথ্যের দ্বারা যদি দেখা যায় যে সে-তত্ত্ব টিঁকছে না, তবে নবলব্ধ ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার অর্থাৎ নতুন তথ্যের আলোকে পূর্ব-তত্ত্বের সংস্কার প্রয়োজন হয়। সমাজ-বিজ্ঞানেও তাই। আসলে বিজ্ঞানমাত্রেরই রীতি এই। দু' একটা উদাহরণ দিচ্ছি।

শিল্প-বিপ্লবের পর থেকে যেখানে-যেখানে যন্ত্র-শিল্প গড়ে উঠেছে, সেখানে-সেখানেই ব্যাপক ভাবে একটা করে 'শ্রমিক' শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছে। সেইজন্য, আওয়েন্-ফুরিয়ের ভাববাদী সমাজতন্ত্র থেকে শুরু করে মার্ক্‌স্-এঙ্গেলসের বাস্তববাদী সাম্যবাদ পর্যন্ত প্রধানত 'শ্রমিক' সংগঠনের উপরে 'তত্ত্ব' গড়ে উঠেছে এবং সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী বিপ্লবের ভিত্তিই করা হয়েছিল শিল্পগত শ্রমিক বা 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল্ লেবার' সংগঠন। তাই, মার্ক্‌স্ থেকে লেনিন (প্রথম বিশ্বযুদ্ধের স্তর) পর্যন্ত ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, যে-সব দেশ শ্রম-শিল্পে সবচেয়ে অগ্রসর—যেমন ইংলণ্ড বা জার্মানী—সেইখানেই বিপ্লব গোড়ায় শুরু হবে। এই গেল 'তত্ত্ব'।

কিন্তু বাস্তব তথ্যের দিক থেকে দেখা গেল, শিল্পে অত্যন্ত অনগ্রসর ও কৃষিপ্রধান রাশিয়াতেই বিপ্লব ঘটল। স্বয়ং লেনিন পর্যন্ত গোড়ায় অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। সুতরাং এই নতুন তথ্যের আলোকে পূর্ব-তত্ত্বকে যাচাই করা দরকার হল।

এইবার তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে ধর্ম বিষয়ে আসা যাক্।

॥ ধর্মে তত্ত্ব ও তথ্য ॥

তত্ত্বের দিক থেকে ধর্ম সত্য কি মিথ্যা, অর্থাৎ ধর্ম-তত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা এখানে অবান্তর। শুধু ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, 'ধর্ম নেই' বা 'ধর্ম গাঁজা ও প্রতিক্রিয়াশীল' এই ধরণের নির্ভেজাল বস্তু-তান্ত্রিক 'তত্ত্ব' আজ সাম্যবাদে বা রাশিয়ার নতুন নয়, যদিও তার ধরণটা নতুন। এ বিষয়ে পর পর তিনটি প্রধান তথ্যের উল্লেখ করছি।

প্রথম : এ-দেশের চার্বাক্-তত্ত্ব, "যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ।" কিন্তু তথ্যের দিক থেকে বাস্তব ইতিহাসে দেখা গেল, সমাজে এই চার্বাক্-তত্ত্ব চালু হল না।

দ্বিতীয় : ফরাসী বিপ্লব। সেখানেও, তত্ত্বের দিক থেকে ধর্ম ও ভগবান বরখাস্ত করে দিয়ে তার জায়গায় বসানো হল 'রীজন্' বা যুক্তিকে। তথ্যের দিক থেকে বাস্তব ইতিহাসে আবার দেখা গেল, ওই তত্ত্ব টিঁকলো না। শুধু তাই নয়, ইংরেজীতে যাকে বলে 'উইথ ভেনজেন্স্' অর্থাৎ সুদে-আসলে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল।

তৃতীয় এবং সব চেয়ে বড়ো উদাহরণ : সাম্যবাদ ও রাশিয়া। মার্ক্‌স্-এর সাম্যবাদ

বল্‌লে, যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে ধনতন্ত্রের বা 'ক্যাপিট্যালিজ্‌ম্‌'-এর লেশমাত্র থাকবে, ততক্ষণ ধর্মের জড় মারা যাবে না। এই ত্রুটির জন্যই আগে-আগে যতবার ধর্মকে খতম করবার চেষ্টা হয়েছে, সে-চেষ্টা টেঁকে নি। সমাজের ধনতান্ত্রিক কাঠামো ও শ্রেণী-সংগ্রাম একেবারে নষ্ট করে ফেল্‌তে পারলে 'ধর্ম' আপনা-আপনি চলে যাবে, কারণ তাকে জীইয়ে রাখবার জন্য কোনো ধনিক বা বণিক শ্রেণী-স্বার্থ থাকবে না। এ হল তত্ত্ব।

এবার দেখা যাক্‌ তথ্যে কি বলে। রাশিয়ায় বিপ্লব হয়েছে ১৯১৭ সালে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেই রাশিয়া একাধিকবার দাবী করেছে যে, সেখান থেকে ধনতন্ত্রকে শ্রেণী-সংগ্রামকে একেবারে উচ্ছেদ করা হয়েছে। অথচ দেখা যায়, গত যুদ্ধের সময়ে, অর্থাৎ বিপ্লবের ছাব্বিশ বছর পরে (বিলাতি হিসাব প্রায় পুরো একটা 'জেনারেশন্‌ পরে,') ক্যান্টেরবরির 'রেড্‌ ডীন্‌' বা লাল পাদ্রীর কাছে স্তালিন বল্‌ছেন : 'রিলিজন্‌ ক্যান্‌ নট বি ডিফিটেড্‌' অর্থাৎ "ধর্মকে পরাস্ত করা সম্ভব নয়।" থিওরি বা তত্ত্বের কথা নয়, তথ্য বা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি।

এখানেই শেষ নয়। বছর দেড়েক আগে কলকাতার কোনো একটি 'সাম্যবাদী' কাগজে এক রুশীয় গীর্জার ছবি বেরিয়েছিল, লোকে ঠাসা। তত্ত্ব নয়, তথ্য। তথ্যে বলছে, আজ বিপ্লবের চল্লিশ বছর পরেও,—যখন ধনিক ও বুর্জোয়া শ্রেণী (রাশিয়ার নিজের স্বীকৃতি অনুসারেই) অতীত যুগের কথা, এবং যে রাশিয়ায় ধর্ম-প্রচার সরকারী ভাবে বে-আইনী, ও সরকারী সর্ব প্রকার সাহায্য-বঞ্চিত,—দেখা যাচ্ছে, সেই রাশিয়ার ধর্মমন্দিরেও অর্থাৎ গীর্জায় উপাসকের অভাব হয় না। ফরাসী-বিপ্লবের মতো প্রবল প্রতিক্রিয়া রাশিয়াতেও আসবে কি-না, সে-কথা ভবিষ্যৎ ইতিহাসের গর্ভে নিহিত।

আজ যুক্তিবাদী, বাস্তব-জ্ঞানী ও স্বাধীন মন নিয়ে :

১। চার্বাক 'মুনি' হওয়া সত্ত্বেও 'ধর্ম'-হীন চার্বাক্‌-তত্ত্ব টিক্‌লো না কেন, ভাববার কথা।

২। ফরাসী-বিপ্লব 'তত্ত্ব' হিসেবে ধর্মকে উড়িয়ে দিলেও সে-তত্ত্ব টিঁকলো না কেন এবং প্রতিক্রিয়া দেখা দিল কেন, ভাববার কথা।

৩। সাম্যবাদ 'তত্ত্ব' হিসেবে ধর্মকে উড়িয়ে দিলেও বিপ্লবের প্রায় অর্ধশতাব্দী পরেও ধর্ম 'পরাস্ত' হল না কেন, ভাব্‌বার কথা।

সুতরাং 'তত্ত্বের দিকে না গিয়ে বাস্তব বা 'অব্‌জেক্‌টিভ্‌' তথ্যের দিক থেকে এবার গত শতাব্দীর বাংলায় ফিরে আসা যাক্‌, ধর্মের ক্ষেত্রে।

॥ গত শতাব্দীর ইতিহাসে 'ধর্ম' ॥

বাংলা দেশে তথা ভারতবর্ষে রামমোহনের আগে থেকেই 'ধর্ম' জিনিষটা ইতিহাসের একটা **বাস্তব** তথ্য হিসেবে বর্তমান ছিল। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ হয়ে হয়ে তার মধ্যে থেকেই মিলনের ভূমি গড়ে উঠছিল। মোগল আমলে আকবরের সময় থেকে নানক কবীর দাদু রজ্জব চৈতন্য প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে এই মিলনের আসন রচিত হচ্ছিল।

এমন সময়ে বাইরে থেকে তৃতীয় একটা শক্তি এসে এখানে রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করলে। এ-শক্তি জাতে ইংরেজ, ধর্মে ক্রীশ্চান। সঙ্গে সঙ্গে এল ক্রীশ্চান মিশন্‌ ও পাদ্রীর দল। একদিকে চল্‌লো হিন্দুকে ক্রীশ্চান্‌ করবার কসরৎ, আর একদিকে চল্‌লো হিন্দু-মুসলমানের যে-মিলন ঐতিহাসিক নিয়মেই গড়ে উঠছিল, তাকে ভেঙে দেবার প্রয়াস।

মুসলমানকে দাবিয়ে দিয়ে, চাকরিতে এবং অন্যত্র হিন্দুকে প্রাধান্য দিয়ে, পৃথক্‌ পৃথক্‌ মুসলমান আইন ও হিন্দু আইন বা "জেন্ট্‌জ্‌" আইন তৈরী করে (যেন মুসলমানরা "জেন্ট্‌,"

বা ভদ্রলোক ছিল না),—নানা ভাবে ক্রীশ্চান্‌ ইংরেজ হিন্দু-মুসলমান বিভেদের বীজ বপন করল যার বিষময় ফল পরবর্তী কালে বিষরূপে ফলেছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত এই ভেদনীতি লক্ষ্য করে তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করে গিয়েছেন।

অর্থাৎ, 'ধর্ম' জিনিষটার এত বড়ো বাস্তব সত্তা তখনকার সমাজে ছিল যে, বিদেশী খৃষ্টীয় শক্তি রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার সুযোগ পেয়েছিল।

ইংরেজ আমলের গোড়ায় এই যে ধর্ম সম্বন্ধীয় পরিস্থিতি বা সমস্যা যার ফলে পরবর্তী কালে ভারতীয় সমাজে বিভেদ অবশ্যম্ভাবী এবং যে-বিভেদের সুযোগে বিদেশী শক্তির পক্ষে এদেশের উপর চেপে বসা ভবিষ্যতে সুগম হবে, তখনকার দিনে সেই সমস্যার দুটি মাত্র সমাধান সম্ভব ছিল :

প্রথম : ধর্মকে একেবারে অস্বীকার করা এবং তার দ্বারা বিভেদের মূল একেবারে নষ্ট করে দেওয়া। সে-জিনিষ করতে গেলে এক সঙ্গে হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ এবং নবাগত বিলাতী রাজশক্তি ক্রীশ্চান্‌ সমাজের সঙ্গে শত্রু হিসেবে লড়াই শুরু করতে হত। সামন্তযুগে,—দেখ্‌লে জাতীয় চেতনা বা গণ-চেতনা বিন্দুমাত্র জাগ্রত হয় নি, এবং কি হিন্দু কি মুসলমান কি ক্রীশ্চান্‌ সমগ্র গণজীবন পুরুত মৌলবী ও পাদ্রীর শাসনে সন্ত্রস্ত,—সে-যুগে এবং সেই যুক্তি-বিচার-হীন, অন্ধ বিশ্বাস ও লোকাচারের উপর প্রতিষ্ঠিত সামন্তী সমাজের পরিবেশে 'ধর্ম'-বর্জনের সংগ্রাম অবাস্তব ও 'ইউটোপিয়ান্‌'।

রামমোহন এদেশের সামন্তযুগে ও সামন্তী সমাজে জন্মেছিলেন এবং তিনি কল্পনা-বিলাসী ছিলেন না, অত্যন্ত বাস্তববাদী ছিলেন। সুতরাং তিনি ধর্মকে অস্বীকার করার **তখনকার পরিস্থিতির পক্ষে কাল্পনিক** ও ইউটিপিয়ান্‌ তত্ত্ব বর্জন করে এবং ধর্মকে বাস্তব সামাজিক তথ্য হিসেবে স্বীকার করে নিয়ে দ্বিতীয় পন্থা গ্রহণ করলেন : অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে 'ধর্ম' বিষয়টিরই একটি বৈপ্লবিক নব মূল্যায়ন বা 'সিন্থেসিস' দিলেন যার দ্বারা ভবিষ্য-ভারতের পক্ষে যুক্তি ও বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত নানক কবীর দাদু চৈতন্যের চেয়ে একটি বৃহত্তর ও বিস্তৃততর মিলনের আসন রচিত হবার সম্ভাবনা তৈরী হল। সেই জন্য তিনি বল্‌লেন, হিন্দু ধর্মের পরিবর্তন দরকার, অন্তত হিন্দুর রাষ্ট্রনৈতিক সুবিধার ও সামাজিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ("at least for their political advantage and social comfort.") এই নব মূল্যায়ন বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় নয়। শুধু একটা কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

॥ রামমোহনী ও ডৈরোজীয় : বিপ্লব ও বিদ্রোহ ॥

ডৈরোজীয়রা হিন্দু ধর্মটাকেই কুসংস্কারপূর্ণ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। রামমোহন সেখানে হিন্দুধর্মকে স্বীকার করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু-মুসলমান-ক্রীশ্চানের বিরোধের **মূল** নষ্ট করে একটি **স্থায়ী** মিলনের ভিত্তি রচনার জন্য—**একটি সম্মিলিত ভারতীয় জাতি গঠনের জন্য**—একটা নূতন সমন্বয়ের ('সিন্থেসিসের') বা ভাষান্তরে 'বিপ্লবের' (গুণগত পরিবর্তনের) সূত্র আবিষ্কার করলেন যার দ্বারা হিন্দু ধর্মের একটি মূল্যায়ন দেখা দিল।

অর্থাৎ, যেখানে তত্ত্ববোধিনী সভাতে যোগ দেবার আগে পর্যন্ত ডৈরোজীয়রা হিন্দুধর্মকে শুধু গালিই পেড়েছেন, রামমোহন রায় সেখানে সমাজের নব রূপায়নের জন্য হিন্দু ধর্মকে স্বীকার করে তাকে **পরিবর্তন** করবার সূত্র দিয়েছিলেন, নবাগত যুগের উপযোগী করে।

পাশ্চাত্য এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সংঘাতে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের বা 'এন্টিথিসিসের' উদয় হয়েছিল, ডৈরোজীয়রা সেই 'এন্টিথিসিস্‌'কেই আরো তীব্র করে দিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য ভাব-

সংস্কৃতির অন্ধ অনুকরণ করেছিলেন। তাঁদের আন্দোলন ছিল পুরোপুরি একটা অস্বীকৃত করবার আন্দোলন, একটা নেতিবাচক বা 'নেগেটিভ্' আন্দোলন (—তাও আবার ব্যক্তিগত ভিত্তিতে, কোনো সংঘবদ্ধ **আন্দোলন** হিসেবে নয়—), কোনো 'পজিটিভ্ সিন্থেসিস'-এর পথ তাঁরা বাংলাতে পারেন নি। তাঁদেরটা ছিল একটা 'রেবেলিয়ন্' বা বিদ্রোহ মাত্র।

সে-জায়গায়, রামমোহনের আন্দোলন ছিল একাধারে 'নেগেটিভ্' (যেমন প্রতিমা পূজাকে বর্জন করা) আন্দোলন এবং 'পজিটিভ্' আন্দোলন, যেমন জাতীয় ঐতিহ্যের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্ম-বলম্বীর সমবায়ে ভারতীয় মহাজাতি গঠনের ভিত্তি স্বরূপ নতন ধর্মসমন্বয়ের পথ বাৎলানো। সেই জন্য রামমোহনের আন্দোলন বিদ্রোহমাত্র ছিল না, 'এন্টিথিসিস্' ছিল না,— ছিল একটা পুরোপুরি বিপ্লব, একটা 'সিন্থেসিস্'। ডৈরোজীয় পন্থায় আছে ভাঙনের ঝোঁক, নেই গড়ার দৃষ্টি। রামমোহনী পন্থায় আছে ভাঙা ও গড়া দুই-ই।

'এন্টিথিসিসের' মধ্যে, জাতীয় ঐতিহ্যহীন নিছক 'নেগেটিভের' বা ভাঙনের আবহাওয়ায় মানুষ চিরদিন বাস করতে পারে না। সেই জন্যই দু'চার জন ডৈরোজীয় মনীষী বিজাতীয় রাজার ধর্মের—ক্রীশ্চান্ ধর্মের—আশ্রয় নিয়েছিলেন, বাকী বেশীর ভাগ শ্রেষ্ঠ ডৈরোজীয়রা রামমোহন-প্রবর্তিত গঠনমূলক 'পজিটিভ' 'সিন্থেসিসের' ধর্ম—"ব্রাহ্মধর্ম"—প্রচারক ও জাতীয় ঐতিহ্য বর্জিত হিন্দু কলেজের এবং জাতীয় ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত রামমোহন রায়ের স্কুলের, দু' জায়গার প্রাক্তন ছাত্র যুবক দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে চালিত তত্ত্ববোধিনী সভাকে আশ্রয় করেছিলেন, এবং রামমোহন শিষ্য ও ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক তারাচাঁদ চক্রবর্তীকে তাঁদের নেতারূপে বরণ করেছিলেন।

রামমোহন ও ডিরোজীয় উভয়েই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারা ও ফরাসী-বিপ্লবের ভাবধারা দ্বারা গভীর ভাবে অনুপ্রাণিত। হিন্দু কলেজের ছাত্র ডৈরোজীয়রা (প্রথম 'ইয়ং বেঙ্গলের দল) ঐ ভাবধারাকে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করলেন ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে এবং বাঙালী হয়েও নিজে-দের মধ্যে প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠান মারফৎ (যেমন 'একাডেমিক্ এসোসিয়েশন্' প্রভৃতি) চিন্তা বিনিময় করতেন ইংরেজী ভাষায়। কিন্তু রামমোহন সেই পাশ্চাত্ত্য ভাবধারাকেই এদেশে প্রবাহিত করবার চেষ্টা করলেন বাংলা ভাষার মাধ্যমে। তাই দেখি, রামমোহনের স্কুলের (যেখানে বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হত) ছাত্র দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে দ্বিতীয় ইয়ং বেঙ্গলের দল তাঁদের দ্বারা স্থাপিত প্রকাশ্য প্রতিষ্ঠানগুলিতে (যেমন সর্বতত্ত্বদীপিকা, তত্ত্ববোধিনী সভা' প্রভৃতি) চিন্তা বিনিময় করছেন বাংলা ভাষায়। ডৈরোজীয়দের প্রতিষ্ঠানগুলির মূল নামকরণ ইংরেজী ভাষায়, রামমোহনীদের প্রতিষ্ঠানগুলির নামকরণ বাংলা ভাষায়।

তত্ত্ববোধিনী যুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত ডৈরোজীয়রা জাতীয় ঐতিহ্য-বর্জিত। রামমোহনীরা জাতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে সমন্বয়ীভূত।

ডৈরোজীয়রা হলেন 'এন্টিথিসিস্'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহী, ঐতিহাসিক 'সিন্থে-সিস্'-এর উপর প্রতিষ্ঠিত 'বিপ্লবী' নয়। প্রতিবেশীর বাড়ীতে গরুর হাড় ফেল্লেই সে-টা মার্কস্বাদ বা বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা অনুসারে "বিপ্লব" হয় না।

পরিশেষে, একটি কথা মনে রাখা দরকার,—হিন্দু কলেজের ছাত্র ও ডৈরোজীয়দের মনের উপর এমন কি স্বয়ং ডিরোজিওর উপর রামমোহন রায়ের সম্ভাব্য প্রভাব। ছাত্রদের উপর অসা-ধারণ প্রতিভাশালী ও স্বদেশপ্রেমিক ডিরোজিওর গভীর প্রভাবের কথা সুবিদিত। কিন্তু এই বিদ্রোহী দলের মনের গঠনে রামমোহন রায়ের কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাব ছিল কি না, সে-কথার কোনো আলোচনা হয় না।

সান্নিধ্য

চিন্তামণি কর

প্রফেসর জিওভানেল্লি

আতলিয়েতে মাদম্ মিউভিল্ একদিন বল্লেন, খোদাই শিখবার জায়গা খুঁজছিলে তার একটা খবর তুমি পাবে আজ আমার এক বান্ধবীর কাছে। তিনি এখানে আজ দুপুরে আসবেন বলেছেন। ঠিক বেলা বারোটায় এক অপরিচিতা ইংরেজ মহিলা এলে তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁর নাম মিস্ হিটন্ পাথরে খোদাই করে ভাস্কর্য রচনায় ইনি বেশ দক্ষ। জিজ্ঞাসা করলাম কোথায় এবং কার কাছে তাঁর শিক্ষা আর সেখানে আমার শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন কিনা। তিনি কথা দিলেন যে আমায় তাঁর শিক্ষক প্রফেসার জিওভানেল্লির কাছে আনছে সোমবার নিয়ে যাবেন।

নির্ধারিত সোমবারে মিস্ হিটন্-এর সঙ্গে উপস্থিত হলাম "রুয়ে দিদ"য় প্রফেসর জিওভানেল্লির আতলিয়েতে। দরজা খোলার আগেই ভিতর থেকে ছেনী ও হাতুড়ির ঘায় পাথর কাটার ঝিক ছিপ শব্দ আসছিল যেন দূর থেকে ভেসে আসা পার্বত্য নির্ঝরিণীর কলোলধ্বনি। ভিতরে ঢুকতে দেখলাম বেশ মোটাসোটা এবং লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক বিরাট একটা মারবেল পাথর কেটে মূর্ত্তি তৈরী করছেন। তাঁর শক্ত মাংসপেশীগুলি সাদা ওভারঅলের ভাঁজে ভাঁজে আত্মপ্রকাশ করছিল। তাঁর মাথায় একটা খবরের কাগজের টুপি ছিল আর তার নীচে চওড়া কপালকে পটভূমি করে ঘন ভুরু সংযুক্ত প্রসন্ন দুটি চোখ জিজ্ঞাসু হয়ে আমার দিকে তাকাল। মিস্ হিটন্ তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি নিজের হাত দুটি অঞ্জলি করে প্রচুর থুথু সংগ্রহ করে তাইতে সাবানের মত হাত কচলে ট্রাউসারের পশ্চাতদেশে বেশ মুছে সাফ করে আমার ডান হাতে হাত লাগিয়ে করমর্দ্দনের এক প্রচণ্ড টান দিলেন এবং সেই মুহূর্তে মনে হল যে আমার সারা হাত খানা কাঁধের সঙ্গে আর সংযুক্ত নেই। তাঁর মুখো-মুতে পরিস্কৃত হাতের ছোঁয়াচে আমার দেহে ও মনে একটা অসোয়াস্তি এসে গেল। কতক্ষণে বাড়ী ফিরে স্নান করে ফের শুদ্ধ হব তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লাম। প্রফেসার যখন শুনলেন যে আমি এসেছি তার ছাত্র হতে তিনি আমার কোটের ল্যাপেলদুটি ধরে এক টান দিয়ে বল্লেন "এত ভদ্রবেশী লোকেরা যে প্রস্তর শিল্পী হতে পারে সে বিশ্বাস আমার নেই। তোমার মত কত লোক এই আতলিয়েতে এসে আমার ধৈর্য্য এবং সময় নষ্ট করে চলে গেছে। তারা দু'ঘণ্টা পাথর পিটে শক্ত ব্যাপার বুঝে দু' একদিনের পর আর আসেনি।" তিনি প্রায় আমাকে আত-লিয়ে থেকে বের করে দিচ্ছিলেন। সাহস করে বল্লাম "কেবল পোষাক দেখে কোন লোকের কর্ম্মক্ষমতা ও নিষ্ঠার মাপ অনুমান করে নেওয়াটা আমার মনে হয় না সর্বক্ষেত্রে ঠিক। আমি আপনার মূল্যবান সময়ের ক্ষতি করতে চাই না আমাকে কাজ দিয়ে একদিনের জন্যে পরীক্ষা করুন এবং অনুপযুক্ত বুঝলে না হয় তখন তাড়িয়ে দেবেন। মিস্ হিটন্‌ও আমার স্বপক্ষে একটু উপরোধ করতে তিনি শেষে আমায় ছাত্র করে নিতে রাজি হলেন। পরের দিন ইঞ্জিন ড্রাইভার-দের মত রু ওভারঅল কিনে এনে আতলিয়েতে কাপড় বদলে তৈরী হলাম পাথর কাটার হাতে কাঁড়ির জন্যে।

রু দিদর থেকে বেরুন যে গলির উপর জিওভানেল্লির আতলিয়ে সে রাস্তার দু ধারে

আরো নানান শিল্পী ও কারিগরদের কর্ম্মশালা। এই আতলিয়েগুলির সামনে একফালি জমি। এর প্রবেশ পথের দিকের দেওয়ালটার প্রায় সবটা ঘসা কাচে ঢাকা। ভিতরে কেবল একখানি চৌরশ বড় কামরা এবং একমাত্র সামনের কাচের দেওয়ালে কয়েকটা ছোট ভেনটিলেসন্ জানলা ছাড়া আর তিন নিরেট দেওয়ালে আলো বা বাতাস যাতায়াতের কোন ফাঁক নেই। প্রত্যেক কর্ম্মশালার সামনের জমিতে দেখা যেত আতলিয়ে সংক্রান্ত কাজের আবর্জ্জনার গাদা। জিওভানেল্লির ঘরের সামনে ছিল ভাঙ্গা পাথর কুচির ছোট বড় কয়েকটি স্তূপ এবং নিকটে সাময়িক শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি এবং তাঁর বন্ধুবর্গ অনেকেই ঐ স্তূপগুলির আড়ালে সে কাজ সারতেন। ফলে তাঁর কর্ম্মশালার অস্তিত্ব দরজায় পৌঁছাবার আগেই নাকের মারফতে লোকে জানতে পারত। আমি প্রথমে এর কারণ না জানায় ঝাঁঝাল গন্ধের উৎস কোথায় বুঝে উঠতে পারিনি। একদিন দেখলাম প্রফেসার ঐ স্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাথরুমের কাজ সারছেন। হঠাৎ রাগ সামলাতে না পেরে তাঁকে এই অস্বাস্থ্যকর ও অশিষ্ট অভ্যাস সম্বন্ধে বেশ বড় একটা লেকচার দিয়ে ফেল্লাম এবং তাঁর থুথু দিয়ে হাত পরিষ্কার করায় আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও জানিয়ে দিলাম। তিনি নবাগত ছাত্রের এরকম অক্ষমনে বেশ আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বিরামহীন ঝগড়া করে শেষ পর্য্যন্ত ঐ নোংরামী বন্ধ করতে পেরেছিলাম। মনে আছে এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে জিওভানেল্লি আমাকে বলেছিলেন "বন্ধুদের কামরায় গিয়ে বসে যে আরাম ও খোসগল্প করতাম তার সুখ নষ্ট করেছ তুমি কারণ তাদের ঘরের আসেপাশের পরিচিত গন্ধ আমার নাকে এখন আর সহ্য হয়না। তোমার মত সোফেস্টিকেটেড্ লোককে ছাত্র করার এই প্রতিফল। বল্লাম "অস্বাস্থ্যকর জায়গার বাতাসকে পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা ম্যাসিয় ম্য প্রফেসার সোফেস্টিকেসন্ নয়। ভুলে যাবেন না আমি ছাড়া একজন ভদ্রমহিলাও এখানে কাজ করে থাকেন। অন্ততঃ এইটুকু শিষ্টাচার তাঁর নাম্য পাওনা।"

আমাকে কাজের জন্যে তৈরী দেখে জিওভানেল্লি বল্লেন "গলির মোড়ে রু দিদর ফুটপাথে একটা মার্বেল পাথর পড়ে আছে সেটা আতলিয়েতে নিয়ে এসো" বলেই আমার মাথায় একটা খবরের কাগজের টুপি পরিয়ে দিলেন। কিছু বলতে যাবার আগে জানিয়ে দিলেন যে চারিদিকে পাথরের মিহি গুঁড়ো উড়ছে তার থেকে মাথা ও চুল বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থা। সেই অদ্ভুত সাজে সদর রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা করলাম সকলে আমার এই সংগিরি দেখে হাসবে কিন্তু কেউই আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। তবুও মনে হতে লাগল যেন সকলের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ এবং তারির অসোয়াস্তির অনুভূতি নিয়ে চেষ্টা করলাম পাথরটাকে তুলে মেলে গড়িয়ে আনতে। কিন্তু বহুমণ ওজনের সেই পাথরটির এক পাশ একটু উঁচু করে তোলা ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হল না। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম আমাকে তাড়াবার এ একফন্দি। কিছুক্ষণ পরে জিওভানেল্লি এসে পাথর না এনে দাঁড়িয়ে আছি বলে বেশ ধমকে দিতে শুরু করলেন। বল্লাম তাঁর মত শক্তিশালী মানুষও ওটাকে ষ্টুডিয়োতে তুলে নিয়ে যেতে পারবে কিনা আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তিনি বল্লেন "তোমায় ওটা উঠিয়ে আনতে তো বলিনি বলেছি কেবল আনতে। যাও আতলিয়ে থেকে তিনটে কাঠের মোটা রোলার নিয়ে এস।" সেগুলি আনতে তিনি পাথরের এক পাশ উঁচু করে তলায় একটা রোলার লাগাতে বল্লেন এবং তার অন্য পাশেও তেমনি করে আর একটা রোলার লাগান হল। তারপর পাথরের সামনেরদিকে নীচে ক্রমান্বয়ে রোলার লাগিয়ে সেটাকে সহজে আতলিয়েতে গড়িয়ে আনা গেল। এরপর বড় একটা পাথরের টুকরো একটা ষ্ট্যান্ডের উপর লাগিয়ে বল্লেন "এটাকে কাটতে শুরু কর।" জিজ্ঞাসা করলাম কেটে কি তৈরী করব। উত্তর এল "কিছু না কেবল পাথরটাকে কেটে শেষ করে দাও।" আড়াই সের ওজনের হাতুড়ি এবং তারি অনুপাতে ভারি মোটা ছেনী দিয়ে কোনদিন পাথর কাটিনি। কাজেই আনাড়ির মত হাতুড়ি ঠিক ছেনীর উপর পড়ছে কিনা দেখতে গিয়ে তার ফলা পিছলে গিয়ে হাতের আঙ্গুল ছড়ে গেল। পরে ছেনীর ফলা ঠিক পাথরের উপর পড়ে কাজে কিনা লক্ষ্য করতে গিয়ে হাতের উপর হাতুড়ি বসিয়ে দিয়ে দিলাম। রক্তাক্ত ও জখম হাতে ফুঁ দিয়ে যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করছি দেখে জিওভানেল্লি জমি থেকে এক মুঠো পাথরের গুঁড়ো নিয়ে হাতের ক্ষতের উপর ঢেলে এবং ঘসে তার উপর দুটো চাপড় দিয়ে বল্লেন "ব্যাস্ ঠিক হয়ে গেছে আর রক্ত পড়বে না এইবার কাজ করে যাও।" পাছে যন্ত্রণা পাচ্ছি জানালে আমাকে একাজে অনুপযুক্ত বলে তাড়িয়ে দেন তার ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহন শক্তিকে যতদূর সম্ভব একত্র করে ফের শুরু করলাম হাত, হাতুড়ি, ছেনী ও পাথরের ঠোকাঠুকি।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় দরজায় টোকা পড়তে প্রফেসার বল্লেন "আঁত্রে"। "বঁজুর" বলে রুজা ঢুলে লম্বা ফরাসী রুটির লাঠিভরা ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে প্রবেশ করল এক প্রৌঢ়া। "বঁজুর মারি" বলে জিওভানেল্লি তার পশ্চাতদেশে চিম্‌টি দিয়ে তার হাত থেকে একটি রুটির লাঠি তুলে নিলেন। মহিলাটি "ওঃ ম্যাঁসিয় তুমি ভারি দুষ্টু" বলে কপট ভর্ৎসনার একটা অভিনয় করে হেসে চলে গেল। আমি প্রফেসারের এই ইতর জনোচিত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিনি যেন আমার মনের কথা জেনে বল্লেন "তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে আমি একটা গর্হিত কাজ করেছি। বিচলিত হয়ো না। এপাড়ায় সকল শিল্পী ও কারিগরদের রুটি সরবরাহ করে মারি এবং ও মুখে যতই আমাদের এই ব্যবহারে আপত্তির ভাণ করুক সকলেই জানে যে ওকে কেউ চিমটি না দিলে তার ভাগ্যে তাজা ও মচ্‌মচে রুটি মিলবে না। প্রথমে এই ব্যাপার যেন একটা নিকৃষ্ট রকমের রহস্য মনে হোত কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে এই আপাত অশিষ্টাচারের অন্তরালে কোন নোংরামি লুকান ছিল না। এ কেবল এই কারিগর পল্লীর খেলার ছলে শিশুসুলভ মারির প্রতি স্নেহের এক সরল অভিব্যক্তি মাত্র।

ঠিক বারোটা বাজলে যার আতলিয়ে ছিল রু দিদর সদর রাস্তার মোড়ে সে সামনের বাজারের টাওয়ারএর ঘড়ি দেখে তার পড়শীর দেওয়ালে টোকা দিয়ে বল্‌ত "ইল্ এ মিদি" অর্থাৎ এখন বারোটা বেজেছে। অপরজন আবার তার পড়শীর দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে সময় জানিয়ে দিত। এমনিভাবে গলির শেষ প্রান্তের আতলিয়েতে বারোটা বাজার খবর চলে যেত যদিও সেখানে পৌঁছাতে সময়ের কাঁটা ঘুরে যেত আরো বেশ কয়েক মিনিট। তারপর শিল্পী কারিগররা যে যার কামরায় হাতের যন্ত্রপাতি নামিয়ে কেউ কেউ বা ময়লা হাত সাফ করার ভনিতা করে যেত কেউ বা ঝাঁঝাঁ ভোজনে। এক ডেলা কড়া চীস্-এ কামড় দিয়ে মচ্‌মচে রুটির দু'এক টুকরো মুখগহ্বরে ফেলে বোতল থেকে লালমদিরার এক ঢোকের সমন্বয়ে তারা পৌঁছে দিত খাদ্যকে গন্তব্য স্থানে। আহারান্তে গা এলিয়ে দিয়ে আরম্ভ হোত গল্প-সল্প ও ধূমপান। এ পাড়ার বাসিন্দারা প্রায় সরলেই ছিল ইতালিয়ান এবং এদের গল্পের বিষয় বস্তু যাই হোক না কেন প্রতিদিন মুসোলিনিকে কুক্কুত একবার জাহান্নামে পাঠিয়ে তাঁর পিণ্ডপাত না করলে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন ঠিক পরিপাক হোত না। দুটো বাজলেই আবার দেওয়ালে সঙ্কেত ধ্বনি বেজে উঠত এবং তাদের আয়াস এলান দেহে কিসের ছোঁয়ায় যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠত এবং এসে যেত কর্ম্মের ব্যস্ততা ও তৎপরতা। এমনি করেই পাঁচটা বাজলে সেদিনের মত কাজ শেষ হয়ে যেত। ওভারঅল খুলে সার্টের আস্তিন নামিয়ে মুখ হাত ধুয়ে মুছে, টাই লাগিয়ে কোট চাপিয়ে যে যার বাড়ীর দিকে ধাবমান হ'ত।

কয়েকমাস পরে একদিন মারি এল কান্নাভরা মুখ নিয়ে। জানাল সে আর রুটি সরবরাহ

করবে না কারণ সে চলে যাচ্ছে মিদিতে (দক্ষিণ ফ্রান্সে) তার এক ভাইঝীর কাছে। সম্প্রতি পিতার মৃত্যুতে সে হয়েছে একটি বড় ক্যাফের অধিকারিণী এবং তার পক্ষে একা ব্যবসা চালান সম্ভব হবে না বলে সে অনুরোধ করেছে মারিকে সেখানে যেতে এবং আমৃত্যু তার কাছে থেকে তাকে ব্যবসায় সাহায্য করতে। কোন বিস্মৃতির সীমানা থেকে হঠাৎ এই রক্তের টানের আহ্বান মারিকে ব্যাকুল করেছে তার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায়।

রুদিদর শিল্পী ও কারিগররা সকলে চাঁদা তুলে মারিকে একটা ভাল গরম কোট বিদায় স্মৃতি হিসাবে উপহার দিল। সেটা নিয়ে সে হেসে বল্ল "মিদিতে তো শীতে পারীর মত ঠাণ্ডা পড়ে না। তবুও এটা পরব এবং তোমাদের স্নেহের কথা মনে করে 'ব' দিয়ো'র কাছে প্রার্থনা জানাব যে তিনি যেন তোমাদের সর্বদা নিরাপদে ও গরমে সুস্থ রাখেন।" তারপর সে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেল্ল। আপন ভাইঝীর টানের জোর বেশী হলেও রুদিদর এতগুলি স্নেহভরা হৃদয়ের বন্ধনকে ছিন্ন করার সংকল্পে মারিকে মনের সঙ্গে অনেক ব্যথার লড়াই করতে হয়েছিল। পাড়ার বাসিন্দারা একে একে তার অশ্রুসিক্ত গণ্ড চুম্বনে বিদায় সম্ভাষণ জানাল এবং তাদের অনেকেরই চোখ শুকনো ছিল না। তারপর সকলের কন্ঠে এক কোরাস্ বেজে উঠল—বিদায় মারি—আদিয়ো।

পরের দিন রুটি দিয়ে গেল এক বৃদ্ধ। বারোটায় মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে জিওভানেল্লি রুটিতে দু' এক কামড় দিয়ে চিবিয়ে থু করে ফেলে বল্লেন "কি অখাদ্য রুটি দিয়েছে বুড়োটা।"

রুটি আসলে মোটেই খারাপ ছিলনা কেবল মারির হাতের স্পর্শ পাইনি বলে সে রুটির স্বাদে প্রফেসার সুখ পাননি। সেদিন রু দিদর শিল্পী-পাড়ায় অনেকেরই মধ্যাহ্ন ভোজন গলাধঃকরণ করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।

সঙ্গীতের বিবর্তন ও বাদ্যযন্ত্র

মানুষের কথা বলার প্রথম প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই সঙ্গীতের উৎপত্তি। আশ্চর্য লাগলেও কথাটা সত্য যে, একস্বরে কথা বলা নাগরিক সভ্যতারই বিশিষ্ট দান। প্রাদেশিক গ্রাম্য 'বোলি'তে কিন্তু এখনও স্বরের প্রচুর তারতম্য দেখা যায়।

বাদ্যযন্ত্রের প্রাচীনতা কিন্তু এত সহজেই নির্ণিত হয় না। সভ্যতার আদিমতম যুগের আলেখ্যে যে সকল বাদ্যযন্ত্রের কথা প্রথমেই পাওয়া যায়, তারা হলো ভেরী বা ঢাক আর ছড়ি (সঙ্গীত কার্মুক)। ঢাক পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া গেছে। এর প্রথম কাজ ছিল, দূরগত মানুষকে ডেকে আনা; দ্বিতীয়তঃ শত্রু — মানুষ বা পশু যাই হোক,— তাকে ভয় পাওয়ানো। সমাজ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বিবর্তনের তালে মানুষের প্রাণসত্তার তাল মিলিয়ে আনন্দ-সঙ্গীত বাজতে লাগলো ভেরীতে, যেমন বাজে বাদ্যির হৃদয়ে। কল্পিত সময়ের সমবিভাজনের একটা আনন্দ আছে; জীবনে সে আনন্দের উৎপত্তি হয় বাহ্যিক সময়কে বিজয় করা থেকে।

ভেরীবাদন রুচিশীল শিল্পকর্মের রূপ নেবার আগেই ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো। আমেরিকার আদিবাসী রেড ইণ্ডিয়ানদের মধ্যে আজও ভেরী বাদনের জটিল তাল দেখা যায়— যেগুলি প্রকৃত প্রস্তাবে সময়ের চারপাশে বোনা সঙ্কেতজাল ছাড়া কিছু নয়। মর্সের সঙ্কেতের মত শ্রোতব্য দূরত্বের মধ্যস্থিত ভেরীবাদন কেন্দ্র থেকে একটি খবর বহু দূরত্বে প্রচারিত হতে পারে এই ভেরীর সাহায্যে। মধ্য আফ্রিকায় এই ভাবে একটা সহজ প্রচার ব্যবস্থা আছে। সেখানকার ঢাকগুলি তাই প্রকাণ্ড আকারের হয়। গভীর অরণ্যে এই সব ঢাকের গম্ভীর অথচ বজ্রগর্ভ-ধ্বনি নিয়তির নির্মম পদধ্বনির মতই ভীতিপ্রদ।

শক্তিকে সব সময়েই আধিভৌতিক অস্পর্শবেদ্য কিছুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে ধরা হয়। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে বলতে হয়, মানব মস্তিষ্ক এই চিন্তাধারারই অনুসরণ করেছে। সেই জন্য পৌরুষের প্রতীক ভেরী ঠাঁই পেয়েছে দেবালয়ে। কাঁসর, করতাল বা ঘন্টা এই ভেরীরই পরিবর্তিত রূপ, আর্য সভ্যতার ধাতুযুগে এদের সৃষ্টি।

ভেরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল নৃত্যের। নৃত্য ব্যায়াম আর ভঙ্গীমূলক অভিনয়ের তাল সংযুক্ত মধ্যমা মাত্র। মানব মস্তিষ্কে শুদ্ধ তাল অপেক্ষা নৃত্যের প্রভাব বেশি, কারণ এর সঙ্গে অভিনয়ও জড়িত।

সমভূমির প্রকাণ্ড নদীর মত সময় আমাদের দৈনন্দিন জীবনের মধ্য দিয়ে বয়ে চলেছে, তার গতিপথ রুদ্ধ হলেই,—যেমন তাল বন্দিতে হয়,—আমরা তার উপস্থিতি উপলব্ধি করি। তখনই আমরা হৃদয়াবেগের ব্যথা অনুভব করি, সময়ের অনন্ত নিস্তরঙ্গ বুকে জাগায় ঘটনার তরঙ্গ, গান বা নাচের মধ্য দিয়ে এই সব অনুভূতি প্রকাশ লাভ করলে রসের মুক্তি অনুভূত হয়।

কাজেই তাল, নৃত্য, কণ্ঠসঙ্গীত আর সকলের চেয়ে জটিল যন্ত্রসঙ্গীত — এই কয়টি স্তম্ভের উপরই দাঁড়িয়ে আছে সঙ্গীতের ইমারত। সূক্ষ্মতার দিকে লক্ষ্য রেখে সঙ্গীতের

ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণ করলে সংগীতের বিভিন্ন অংশের এইভাবে স্তর ভেদ করা যায়— তাল, নৃত্য, কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত। কণ্ঠসংগীতের সৌন্দর্য ভাষা বিহনে নিষ্প্রভ, সুষ্ঠুগতি বিনা নৃত্য অর্থহীন; কিন্তু যন্ত্রসংগীতে প্রকাশের জন্য কোন কিছুরই সাহায্য লাগে না, কারুকলার সকল বিভাগের তুলনায় যন্ত্র সংগীতই বোধহয় সবচেয়ে সাঙ্কেতিক।

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, ভারতীয় নৃত্যে বিশেষতঃ ভরত নাট্যমের মুদ্রাও তো সাঙ্কেতিক। কিন্তু সাধারণ দর্শকে কি তার প্রিয় কলার মূল্য সাঙ্কেতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করেন? সাধারণ সিনেমা-দর্শক কোন অপরূপার নৃত্য ভঙ্গিমায় মুগ্ধ হলেও আলকরিপু, যোতিশ্বররমু, বর্ণম্ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ আর তারা আলাপম্ম, সুচীমুখ, ত্রিপাটক ইত্যাদি মুদ্রার প্রয়োজনীয়তাও জানে না। একটি সুঠাম দেহবল্লরীর সতালগতিই আনন্দদানের পক্ষে যথেষ্ট, কোন কলাবিদ্যাকে তার স্বীকৃতস্থান থেকে হেয়তর করার কোনরূপ ইচ্ছাই আমার নেই, কিন্তু উপরের কথাগুলি সংগীতের মূল্য নির্ধারণের মূল কথার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতালব্ধ ফিরিস্তি মাত্র।

কণ্ঠসংগীতেও কথা না থাকলে তার বৈশিষ্ট্য লুপ্ত হয়। সেই জন্যই জনপ্রিয় কণ্ঠ সংগীত খেয়াল ও ঠুংরীতে গানের কথার মধ্যে আলাপ নিষিদ্ধ।

যন্ত্রসংগীতের সৃষ্টি স্বরের আল্পনায়; এই স্বরগুলি নিজেরা সম্পূর্ণ সাঙ্কেতিক হলেও কোন এক অজ্ঞাত কারণে আমাদের রসিকসত্ত্বার অতি নিকট আত্মীয়। কোন আদিম শিকারীর ধনুতে যন্ত্রসংগীতের প্রথম প্রচেষ্টা থেকে আজ পর্যন্ত যন্ত্রসংগীতের জটিলতা একই রকম আছে। তারের প্রসারণ ছড়ির চাপের পার্থক্যে নিয়ন্ত্রিত করে স্বরের পরিবর্তন ঘটানো যায়। হিমযুগের এই একমাত্র যন্ত্রই আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে।

যন্ত্রের ছড়ির সঙ্গে ধনুকের যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল একথা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। অতিরঞ্জন বাদ দিয়ে মানবজাতির পৌরাণিক কাহিনীতে অতি প্রাচীনকালে, মানুষ যখন সবে যুথবদ্ধ হতে শিখেছে তখনকার সামাজিক অবস্থা জানা যায়। পৌরাণিক বীরের স্কন্ধে ভৌতিক ও আধিভৌতিক সকল রকম ক্ষমতাই অর্পণ করা হয়েছে। প্রতিটি কাহিনী তাঁদের ধনুর্বাণের অদ্ভুত ক্ষমতার কথায় পূর্ণ। ধনুতে টঙ্কার দিলেই ভয়ঙ্কর শত্রু সৈন্যদলও ভয়ে নির্বাক হয়ে যেত। একাহিনী অনুসারে, যুদ্ধ তখন যেন কণ্ঠ আর তার সহযোগী যন্ত্রেরই এক্তিয়ারে ছিল। মানব মনের আবেগকে জাগ্রত করবার এই অন্তর্নিহিত শক্তিই সংগীতকামুককে সংগীত-মন্দিরের দ্বারা উন্মুক্ত করার ক্ষমতা দিয়েছিল।

পশ্চিমী পৌরাণিক কথার আদম ইভের সঙ্গে মানবজাতির যে সম্পর্ক, ভেরী বা সংগীত কামুকের সঙ্গে সকল সংগীত যন্ত্রেরও সেই একই সম্বন্ধ। কিন্তু মানবজাতির পূর্বপুরুষরা মাটির এত গভীরে সমাহিত যে, কিংবদন্তী ছাড়া তাদের কোন খোঁজই মেলেনা। অথচ বাদ্যযন্ত্রের পূর্বপুরুষরা এখনও যে মাঝে মাঝে মাটির তলা থেকে মাথা তোলেন — পুরাতাত্ত্বিকরা একথার সাক্ষ্য দেবেন।

ভারতের বীণা মিশরের বিল্ট আর গ্রীসের কিথার — একই পূর্বপুরুষ সংগীতকামুক থেকে উদ্ভূত। এদের প্রথম যোগ ছিল শুধু ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে। তারপর এদের ঠাঁই হলো জনতার উৎসবে। গ্রীসের গ্ল্যাডিয়েটরদের যুগে, সময় সময় হাজার হাজার কিথার বাজানো হতো হৃদয়হীন দর্শকদের সামনে পরাজিত গ্ল্যাডিয়েটরের আকুল কান্না চাপা দিতে। মানবজাতির বৈষয়িক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কিথার থেকে বহুপ্রকার তারের যন্ত্রের উদ্ভব হলো — যেমন, হার্প, নিউট, আরবের আলউড্, আরবের টানা রবাব, শার্লামেনের যুগের তুর্কীস্থানের

ছাঁচটানা রবাব ও আধুনিক মরক্কোর গুণেবিরা।

ভারতীয় বীণা ছিল একটি গোষ্ঠিগত নাম। এতে ঘা দিয়ে আর ছড়ি দিয়ে বাজানো, এই দু'জাতের যন্ত্রই ছিল। কিন্নরী, ঘোষ্যতী, পিনাকী, ত্রিতন্ত্রী ছিল বীণারই রূপ। আলফারাবী আর আবু আলি ইবন সিনার সময়ে, প্রাচীন আরবের প্রথম যুগে — আরিষ্টটলের ফিলোষ্ট্রাটাস ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সকল যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করা হয়, সুতরাং মুসলমানী সংগীত সংস্কৃতির ইতিহাসে দুটি বিভিন্ন চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায়— ভারতীয় ও গ্রীকোরোমান। তেমনি মেইজি যুগের আগে জাপানেও দুটি ভাবধারার প্রভাব দেখা যায়—পশ্চিমী ও চীনা-ভারতীয়। কাজেই আলউড্, স্বারউড্ (আধুনিক স্বরোদ) ইত্যাদি সাধারণভাবে ঘাটবিহীন তারের যন্ত্রের উৎপত্তি পশ্চিমী ভাবধারা থেকে; সেতার, একতারা থেকে সাততারা (ভারতের সপ্ততন্ত্রী বীণা) মূলতঃ ভারতীয় ভাবধারার দান। লিউট জাতীয় যন্ত্রে প্রথমতঃ তাঁত ব্যবহৃত হলেও বীণাতে (ইতিহাস থেকে যা জানা যায়) চিরকালই তার ব্যবহার করা হয়েছে।

বাতাসের সাহায্যে বাজানো যন্ত্রের মধ্যে শঙ্খ, তিব্বতের লিংপো বা বিউগল এক না একভাবে বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হলেও বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বিশেষ নাম নেই এদের। কিন্তু বাঁশীর কথা সম্পূর্ণ আলাদা, এর শুরু ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। গ্রামীন সংস্কৃতির সঙ্গে এর যোগ চিরন্তন। প্রাচীনযুগের মাটির বাঁশীও পাওয়া গেছে। আবার প্রাচীন যুগের প্রথম দিকে আধুনিক হারমোনিয়ামের জনক অর্গাননের সন্ধানও পাওয়া গেছে। ইউরোপের বাঁধা স্বরের এই যন্ত্রটির জন্যই বোধহয় নিয়মিতভাবে স্বরের সমন্বয় সাধন সম্ভব হয়েছে।

আরব এবং চীনে ত্রয়োদশ শতাব্দীতেই নল বা চাবি বসানো—দু'রকম অর্গানের খবর জানা ছিল।

আসিরীয়দের পরিচিত মাটির টাইগাই আগেকার দিনের এক প্রকার বাঁশী। এর একটি লন্ডন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। প্রাচীন মিশরে একগজ লম্বা একটি বাঁশী 'মাতা' বাজানো হতো। ইহুদীরা ভগবানের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য একগজ শিঙ্গা বাজাতো, 'মায়া'রা তারের যন্ত্রের কথা জানতো না বটে, তবে বাঁশী জাতের হুইজা ক্যাপিটজেইলি, কুইরাস্কেজাকা ও আরো অনেক যন্ত্র তারা ব্যবহার করতো। 'চিহ' হলো চীনের প্রাচীনতম বাঁশী।

চতুর্দশ শতাব্দীতে এক ভারতীয় সংগীতবেত্তা শার্ঙ্গদেব বাঁশীজাতীয় যন্ত্রের একখানা ফিরিস্তি দিয়েছেন — বংশ, পাবা, পাবিকা, মুরলী, মাধুকরী, কহলাচ, তুম্বুকী, বুক্ক ও শৃঙ্গ।

বাঁশীই হচ্ছে একমাত্র যন্ত্র যাতে হৃদয়াবেগের কোন ঝোঁক পড়ে না, এর ধরণটি সম্পূর্ণ পক্ষপাতশূন্য। একে অতি সহজেই দুঃখ বা আনন্দের সময় ব্যবহার করা যায়। সেইজন্যই বোধহয় এটি সর্বসাধারণের সামগ্রী হয়ে আছে।

যান্ত্রিক যুগে বাদ্যযন্ত্রের অগ্রগতিতে এক আকস্মিক উন্নতি দেখা গেল, প্রেসিয়া ও ক্রেমোনার বেহালা তৈরী রীতি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়ায়, জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলন্ড ব্যবসায়িকভাবে আধুনিক ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্র সৃষ্টির কাজে প্রবৃত্ত হলো। বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে উৎকট উচ্চতর সুরের প্রসার বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে। বর্তমান যুগে বৈদ্যুতিক শক্তির উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে সূক্ষ্মতা বেড়ে চলেছে।

কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করবেন প্রকৃতির শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি হল মানবদেহ এবং যান্ত্রিক উপায়ে তার সৃষ্টি করা মানুষের সাধ্যাতীত। যদিও কেউ বৈদ্যুতিক গণনাযন্ত্রের কথা এর বৈপরিত্য বোঝানোর জন্য উদাহরণ স্বরূপ বলেন তো তিনি ঠিকও বলবেন আবার ভুলও করবেন। কারণ, এ যন্ত্র সন্তানোৎপাদন করতে পারে না, আবার সমব্যবহারও করতে পারে

না। মানুষের আদিম ও প্রাথমিক বৃত্তি অর্থাৎ আনন্দ বা ব্যথার কোন বোধই এই যন্ত্রদানব বা যান্ত্রিক মানবের নেই।

মানুষের কণ্ঠস্বরে বহু জটিলতা আছে; একজন পদার্থবিদ গাণিতিক হিসাবের দ্বারা দেখাতে পারেন যে, একটি ব্যঞ্জনবর্ণ উচ্চারণ করতে গিয়ে কতগুলি কাজ করতে হয়, কিন্তু মানুষ প্রকৃতি ও তার নিয়মের পরিপূরণে কখনই পেছ পা হয়নি। সেই জন্যই সে এত রকম বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করতে পেরেছে, যাদের স্বরবৈচিত্র মানব-কণ্ঠস্বরের নাগালের বাইরে। মানব-কণ্ঠস্বর যত বেশি শক্তিশালীই হোক না কেন, তার (যান্ত্রিক সাহায্য ছাড়া) প্রকৃতি একবেয়ে বিশিষ্ট এবং তাতে শিল্পী ও শ্রোতার মানসিক পরিবর্তন সত্ত্বেও মূলগত পরিবর্তনের সম্ভাবনা অতি স্বল্প। মানুষ একঘেয়েমীর পাঁক থেকে মুক্তি পাবার জন্য যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যাতে প্রকৃতিগত যতরকম পরিবর্তন সম্ভব তা করা যায়। আধুনিক সুর-সৃষ্টিকার সুনিশ্চিতভাবে একটি বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে সুরের মানবিক চিত্রে একটি বিশেষ রূপারোপ করতে পারেন।

যন্ত্রসঙ্গীত সমাজের সৃষ্টি, সুতরাং তা শ্রেণীর কৃষ্টি। অন্যপক্ষে কণ্ঠসঙ্গীত যন্ত্রের সাহায্য না পেলে ব্যক্তিগত হতে বাধ্য। সেই জন্যই সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বিবর্তন মানুষকে ক্রমশঃই শ্রেণীকেন্দ্রিক করে তুলছে, এবং তার ফলে যন্ত্রসঙ্গীতই জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। ভারতেও সাধারণ শ্রোতার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। জিজ্ঞাসা করলে—(যদি কখনও করা হয়) অন্য যে কোন পরিবর্তিত ঢঙ্-এর তুলনায় ফিল্ম-সঙ্গীতের পক্ষেই জনসাধারণ মত দেবেন। কারণ, আমাদের আধুনিক ফিল্ম-সঙ্গীতকাররা মানব মনের উপর যন্ত্রসঙ্গীতের স্বতঃস্ফূর্ত আবেদনের কথা জানেন, ফিল্ম-সঙ্গীত থেকে যন্ত্রসঙ্গীত সরিয়ে নিলে ফল হবে মারাত্মক। সেক্ষেত্রে সিনেমা মালিককে অহিংসাভাবে জনতার ক্রোধকে শান্ত করবার জন্য দমকল বাহিনীকে খবর দিতে হবে। আর গোলমালে এতকালের নীরব দর্শক অর্থাৎ পর্দার, জোয়ান অফ আর্কের দশা হবে।

এযুগে সঙ্গীতের মূল্য গ্রহণের নূতনতর ও আমূল পরিবর্তিত মূল্যমান নির্ধারণ একান্ত প্রয়োজন। অন্যথায় জাতীয় সংস্কৃতির ধ্বজা তুলে আমাদের তথা ও বেতার দপ্তরের মূল্যবান রাগসঙ্গীতকে উন্নততর করার বিরাট প্রচেষ্টা জনসাধারণের কাছে সম্মান পাবে না। নূতন যুগের সম্ভাবনা কিছুদিন অগ্রাহ্য করলেও চিরকাল অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। ইতিহাসে যে ধ্বংসের কথা দেখি যাতে প্রাচীন গ্রীস, আরব এমন কি জাপানের রাগ সঙ্গীত ধ্বংস হয়েছিল ভারতে তার পুনরাবৃত্তি অবাঞ্ছনীয়। ভারত চরম রাজনৈতিক দুরবস্থার মধ্যেও পরের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে চেয়েছে। সত্যকে পাবার বিভিন্ন পথের কথা ভারত চিরকালই মেনেছে, অর্থাৎ ব্যক্তির চিন্তনীয় সবরকম পন্থাই সে সত্য বলে মেনে নিয়েছে।

গোপীনাথ গোস্বামী

আ লো চ না

বাংলা শিক্ষা সমস্যা

দেড় বছর হতে চলল আমরা দশমিক মুদ্রায় হাট-বাজার লেনদেন করছি, দশমিক মুদ্রায় হিসাবপত্র রাখছি। আর দু মাস পর থেকে ওজনের মাপেও আমরা দশমিক পদ্ধতি গ্রহণ করব।

এই দেড় বছরের হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বুঝছি, এতকাল আমরা অবুঝের মতো সময়ের কী অপচয় ঘটিয়েছি, কীভাবে নিজেদের আয়ুঃক্ষয় করেছি! আমাদের শিক্ষা-জীবনের সূচনায় কড়াকিয়া গণ্ডাকিয়া বুড়িকিয়া পণকিয়া চৌকিয়া শুভঙ্করীর রকম রকম আর্যা মুখস্থ করতে যে গলদ্‌ঘর্ম হয়েছি, তাকে আয়ুঃক্ষয় ছাড়া আর কী বলব! ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সভ্যসমাজে দশমিক এককাবলী গৃহীত হয়। সেই রীতি গ্রহণ করতে আমাদের দেড়-শ বছর কেটে গেল!

আমাদের যা হবার হয়েছে।

কিন্তু আশা করা গিয়েছিল, ১৯৫৮-৫৯ সনের শিক্ষাবর্ষে—দশমিক মুদ্রা প্রচলনের দ্বিতীয় বৎসরে— যে-সব ছাত্রছাত্রী মিশ্র চার নিয়মের অঙ্ক শিখবে তাদের ঘাড় থেকে এই সব আদ্যিকেলে, সময়াপহারক 'কিয়া'র বোঝা নামিয়ে দেওয়া হবে, তাদের শিক্ষাকালের নির্বোধ অপচয় বন্ধ হবে, সুচিন্তিত সদ্‌ব্যয় সম্ভব হবে।

হায় রে দুরাশা! আমাদের পাশে এক প্রাথমিক ইস্কুল আছে। রোজ সকালে সমস্বরে কড়াকিয়া আবৃত্তির শব্দে আমাদের ঘুম ভাঙে। কড়াকিয়া শেখা হলে গণ্ডাকিয়া। তারপর পণকিয়া। তারপর চৌকিয়া। তারপর—এত সব কিয়া আয়ত্ত করার পর — ছেলেরা মুদ্রা-বিষয়ক যোগ-বিয়োগ শিখবে।

কিন্তু কেন? এভাবে সময় নষ্ট করার অধিকার কে দিল? সেই কথার জবাব শুনতে একদিন ইস্কুলে গিয়েছিলাম। জবাব পেলাম : শিক্ষা বিভাগ থেকে কিয়া বর্জনের কোনো স্পষ্ট নির্দেশ নেই। তাই, যা চলছিল তাই চলবে।

কিন্তু কেন? কেন? কেন?

কোনো শিক্ষক এ প্রশ্ন তুলেছেন কি?

প্রশ্ন করতে গেলে চিন্তা করতে হয়। চিন্তা করা আয়াসের কাজ। শিক্ষকেরা তাই চিন্তাও করেন না, প্রশ্নও করেন না। চিন্তা করেন অন্যে, শিক্ষাবিভাগের অধিকর্তারা। শিক্ষকেরা কর্তার ইচ্ছায় কর্ম করে যান।

কী অদ্ভুত অবস্থা! দেশ জুড়ে কাজ কারবার লেনদেন হিসাব-নিকাশ চলছে দশমিক মুদ্রায় আর দেশের ছেলেরা দিনের পর দিন যত রাজ্যের কিয়া মুখস্থ করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে!

কী অদ্ভুত অবস্থা! হাতে কলমে কাজ করছেন যে মানুষ, সমস্যাগুলিকে বাস্তব আকারে দেখছেন যে মানুষ, সমস্যা নিয়ে চিন্তা করবেন যে মানুষ, তিনি নির্বাক। তাঁকে মুখ খুলতে বলাও হয় না, দেওয়াও হয় না।

না, তিনি মুখ খোলেন। পেটে যখন টান পড়ে, সে টান যখন অসহ্য হয়ে ওঠে, তখন তিনি মুখ খোলেন।

কিন্তু শিক্ষানীতির আলোচনার ক্ষেত্রে তিনি নির্বাক। সেক্ষেত্রে চিন্তা করেন অন্য মানুষ।

যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা কেমন মানুষ? তাঁরা শূন্যচারী ত্রিশঙ্কু। বিলিতী বই তাঁরা অনবরত পড়েন, হরবখত নানা দেশ সফর করেন, সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা দেখে আসেন, সেখানকার ডিগ্রীও জুটিয়ে নিয়ে আসেন।

কিন্তু তাঁরা ত্রিশঙ্কু। বাঙলাদেশের এমন এক বানানো জায়গায় তাঁরা বাস করেন, চলেন-ফেরেন, সেখানে আসল বাঙলা দেশের ছায়াটুকুও পড়ে না, যেখানে বাঙলা দেশের সাড়ে পনেরো আনা ছেলেমেয়ের কণ্ঠস্বর পৌঁছয় না।

তাঁরা ছেলেমেয়েদের পড়ান না, তাদের সঙ্গে মেশেন না, এবং এ কথাও নিশ্চিত, তাদের একটুও ভালোবাসেন না। যদি বাসতেন, তাহলে যত রাজ্যের 'কিয়া'র বোঝা তাদের ঘাড় থেকে নামিয়ে দিতে বলতেন।

আসলে, ত্রিশঙ্কুরা তাঁদের মাতৃভূমিকে দেখেন বানানো এক কোণ থেকে, দেশের বৃহৎ সমাজ থেকে বহুযোজনব্যবহিত বিকৃত এক কোণ থেকে, যেখানে শিশুর কণ্ঠস্বর নেই—আছে কেবল কিছু নির্বিশেষ পুঁথিগত ধারণা।

ত্রিশঙ্কুরা কী রকম বাস্তববুদ্ধিবিবর্জিত, এবং আত্মসন্তুষ্ট, তার একটা প্রমাণ জানা আছে।

কয়েক বছর আগে একজন অধ্যাপক একটি অতি সঙ্গত, বাস্তববুদ্ধিপ্রণোদিত প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সে প্রস্তাব ত্রিশঙ্কুদের মাথায় ঢোকে নি।

প্রস্তাবটি হল : স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষার পত্রে যে-সব প্রশ্নে ছাত্র-ছাত্রীদের পঠিত অংশের সাহিত্যিক উপলব্ধির পরীক্ষা দিতে হবে সেই সব প্রশ্নের উত্তর তারা মাতৃভাষায় লিখবে। মাতৃভাষায় লেখা উত্তর থেকেই সাহিত্যগত উপলব্ধির প্রকৃত বিচার হওয়া সম্ভব। প্রস্তাবক অধ্যাপক অন্যান্য সভ্য দেশের পাঠ্যক্রম এনে দেখান, সে-সব দেশের শিক্ষানায়কেরা ত্রিশঙ্কু নন।

আমাদের আত্মম্ভরি ত্রিশঙ্কুরা সে প্রস্তাব কানে তোলেন নি।

ত্রিশঙ্কুরা চিরকালই এই রকম। যাঁরা কিছুটা বাস্তববুদ্ধি ধরেন তাঁরাও দলে ভিড়ে ক্রমে ক্রমে ত্রিশঙ্কু বনে যান।

কিন্তু যাঁরা দিনের পর দিন ছেলেমেয়েদের পড়াচ্ছেন, তাদের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশছেন, তাঁদের এই নিরুদ্যম নিশ্চেষ্টতা আর তরল নিশ্চিন্ততা দেখে-দেখে ভবিষ্যতের সব আশায় জলাঞ্জলি দিতে হয়।

এঁদের অনেকের মধ্যে এক হীনম্মন্যতা দেখা যায়—সেই হীনম্মন্যতাই চিন্তাহীনতাকে লালন করে। কিন্তু তা হবে কেন? কাজের মানুষের আত্মবিশ্বাসের জোর থাকবে না কেন? তাঁরা কেন ভাববেন না? এদেশে শিক্ষকদের দ্বারা পরিচালিত দু-একটি পত্রিকা আছে। পড়ে দেখুন। স্বাধীন চিন্তার পরিচয় কদাচিৎ পাবেন। প্রকাশিত রচনার বেশির ভাগই হল বিদেশী শিক্ষাবিদদের বহুশ্রুত মতের পুনরুল্লেখ। কাজের মানুষ কংক্রীট ভাষায় একটা বাস্তব সমস্যাকে বিচার করছেন, তার সমাধান নির্দেশ করছেন—আশা নিয়ে যদি এই সব পত্রিকা হাতে তুলে নেন,

ভীষণ নিরাশ হতে হবে।

শিক্ষকসমাজের এই চিন্তাবিমুখতাই, নিশ্চিন্ত আজ্ঞাবহতার এই দমবন্ধকরা গুমোটই উপরতলার ত্রিশঙ্কুদের বহাল তবিয়তে রাজ্যপাট চালিয়ে যেতে দিচ্ছে।

আর ছেলেমেয়েদের মনকে মেরে শেষ করে দিচ্ছে।

একটি ছেলেকে বড়ো যত্ন করে বাঙলা বলতে পড়তে — এবং লিখতে — শিখিয়েছিলাম। সে চেষ্টার সফলতায় তৃপ্তি পেয়েছিলাম।

এ সাফল্যের মূলে ছিল অবশ্য রবীন্দ্রনাথের 'সহজ পাঠ'। ঐ বই দুখানির পাঠগুলি বারবার শুনতে-শুনতে, পড়তে-পড়তে, চোখে দেখে আর কানে শুনে লিখতে-লিখতে, পঠিত বাক্যের সমজাতীয় বাক্য নিজে রচনা করে বলতে-বলতে এবং লিখতে-লিখতে খাঁটি বাঙলার বাগ্‌রীতি—বিশেষ করে তার নিজস্ব ধ্বনিস্পন্দ — ছেলেটি বড়ো সুন্দর করে আয়ত্ত করে নিল। দেখা গেল, এমন কি আটপৌরে কথা বলার সময়েও পদবিন্যাসরীতিতে সে ভুল করে না—যে ভুল অর্থভাগ্যে ভাগ্যবান অনেক বাঙালী লেখকও আকছার করে থাকেন। লিখতেও শিখল ছেলেটি— দশ-বারোটি ছোটো ছোটো বাক্যের এক-একটি অনুচ্ছেদ সে বেশ নির্ভুলভাবেই লিখতে শিখল।

সেই ছেলে ইস্কুলে ভর্তি হল। তার নির্বাচিত বাঙলা বই দেখেই আশঙ্কা হয়েছিল—এতদিনের এত পরিশ্রম সব মাঠে মারা যাবে।

সে আশঙ্কা প্রতিদিন নিষ্ঠুরতরভাবে সত্যে পরিণত হচ্ছে।

সমস্যাটি দাঁড়িয়েছে এই :

ছেলেটির মনে সেই বাঙলার ভিত গড়ে দেওয়া হয়েছে যে বাঙলা খাঁটি, বাঙালীর মুখের গভীরভাববহ ইডিয়মগুলিকে গ্রহণ করে যে বাঙলা সজীব, সরস বর্ধিষ্ণু, যে বাঙলায় আধুনিক বাঙালী ভদ্রসমাজ চিন্তা করে, কথা বলে, লেখে।

এই কথা বিচার করে ছেলেটিকে দেওয়া হল এমন এক ইস্কুলে যেখানে 'সহজ পাঠই পড়ানো হয়। নীচের দুই শ্রেণীতে 'সহজ পাঠ' পড়িয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে তাঁরা যে বই ধরালেন সে বইয়ের অধিকাংশ পাঠই সেই বাঙলায় লেখা যে বাঙলায় কোনো বাঙালী কথা বলে না।

সেই বাঙলা এক বানানো—অতএব কৃত্রিম — ভাষা, তার ধ্বনিস্পন্দ আলাদা, তার 'ডিকশন' আলাদা, আধুনিক কথিত বাঙলার সঙ্গে আধুনিক গুজরাতীর পার্থক্য যতখানি, এ বানানো ভাষার পার্থক্য তার চেয়ে খুব কম নয়।

অস্বীকার করার উপায় নেই, একালের বাঙালী মনীষা দীর্ঘকাল এই বানানো ভাষাকে আশ্রয় করেই আত্মপ্রকাশ করেছে। এই বানানো ভাষাই দীর্ঘকাল বাঙালীর বড়ো বড়ো যুগান্তকামী চিন্তা, ভাবনা আর আদর্শের বাহন হয়েছে। বহু গদ্যশিল্পীর হাতে এই বানানো ভাষাই অপরূপ সৌন্দর্যরূপ লাভ করেছে।

আজ এই বানানো ভাষা সংবাদপত্রের স্তম্ভে কোনোক্রমে তার অস্তিত্ব রক্ষা করছে আর শেষের দিন গণনা করছে। সমাজের কর্মজীবন আর ভাবজীবন থেকে এ ভাষার ব্যবধান যতই বাড়ছে, ততই তার কৃত্রিমতা বেশী-বেশী করে অনুভূত হচ্ছে।

কিন্তু সে আরেক প্রসঙ্গ। এই ক্ষেত্রে আমার বলবার কথা এই যে, মাতৃভাষা যথোচিতরূপে শিক্ষা করবার আগে, মুখে বলে আর লিখে মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশের শক্তি যথাসম্ভব আয়ত্ত না হলে, কোনো শিশুকেই অপর ভাষা শেখানো ক্ষতিকর। তাতে তার সবকিছুই

গুলিয়ে যায়,—মাতৃভাষার ভিতও পাকা হতে পায় না অপর ভাষা শিক্ষাও হয় না। মাতৃভাষা ভালো করে শিখতে শিখতেই শিশু ভাষা বস্তুটির প্রকৃতি, রূপ আর প্রয়োগ সম্বন্ধে কয়েকটি সাধারণ ধারণা লাভ করে, এবং তখনই তার অপর ভাষায় প্রবেশ সুগম হয়।

সাধু বাঙলা কোনো বাঙালী শিশুরই মাতৃভাষা নয়। রাঢ়ী উপভাষায় যে শিশু কথা বলে তারও নয়, বঙ্গালী উপভাষায় যে শিশু কথা বলে তারও নয়। সাধু বাঙলা বানানো ভাষা, তার ধ্বনিপ্রবাহের গতিছন্দটি একেবারে অন্য প্যাটার্নের, কানে একেবারে অন্যরকম শোনায়। সেই কারণে, সপ্তম শ্রেণীতে প্রবেশের আগে কোনো বাঙালী শিশুর সামনে সাধু বাঙলা আনা উচিত নয়। এই ভুলটি দীর্ঘদিন ধরে করা হচ্ছে, আর তাই প্রশ্নপত্রে বার বার লিখতে হচ্ছে 'সাধু ও চলিত ভাষা মিশাইয়া লিখিবে না।' কিন্তু এ উপদেশে কোনো ফল হচ্ছে না। হবেও না। ভাষা শিক্ষার আদিকালে দুই ভাষা শেখানোর ভ্রান্তি যতদিন অন্ধের মতো আত্মসন্তুষ্ট নিশ্চিন্ততায় পোষণ করে যাব ততদিন এ উপদেশ বার বার ব্যর্থ হতে থাকবে, শুদ্ধ বাঙলা লেখার ক্ষমতা সাড়ে পনেরো আনা ছেলেমেয়েরই অনায়ত্ত থেকে যাবে।

ত্রিশঙ্কুদের তো তাতে ভারি বয়েই গেল! কিন্তু যাঁরা দেশের ছেলেমেয়েদের বাঙলা শেখানোর ভার নিয়েছেন তাঁদেরও কি তাতে ভারি বয়েই যাবে? নিজের নিজের বিবেকের কাছে কি তাঁরা পার পাবেন?

অশোক ঘোষ

বাংলা কাব্য সাহিত্যে নাগরিকতা

বাংলা কাব্য সাহিত্যে নাগরিকতার ছাপ পড়েছে কবে?

ভারতচন্দ্রের পূর্বে বাংলা কাব্য সাহিত্য ছিল সহজ সরল। পল্লীপরিবেশে পরিবেষ্টিত। কেউ কেউ বলেন, ভারতচন্দ্রের সময় থেকেই বাংলা কাব্য সাহিত্যে নাগরিকতার লক্ষণ লক্ষ্য করা গেছে। এ হয়তো ঠিক, তাঁর সময় থেকেই নগরের পত্তন সুরু হয়েছে। কিন্তু বাংলা কাব্য সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা থেকে আমরা জ্ঞাত হই যে, কালকেতুও নগর পত্তন করেছিলেন। তথাপি সে সাহিত্য নাগরিক অভিধায় অভিহিত হয়নি। নাগরিক অর্থে তাহলে কি বুঝবো জটিল জীবন-সমস্যার কথা? নগর-জীবনের ছাপ? কিম্বা বহুকথিত ধর্মনিরপেক্ষতা।

ভারতচন্দ্রের আগেও বাংলা কাব্য সাহিত্যে জীবন-সমস্যা ছিল। কিন্তু সেই সমস্যা ভিন্নতর। চর্যাগীতি বিনিশ্চয়ের অন্তর্গত যে সমস্যা তা আমাদের জীবনকে তুরীয়লোকে পৌঁছে দেবার জন্যে। সেখানে গোষ্ঠীভূত একটি সাহিত্যের মাধ্যমে চিত্তের শুদ্ধি এবং নির্বাণলাভের কথাই মুখ্য। কৃষ্ণকীর্তন ধর্মাশ্রিত। মঙ্গলকাব্য সাম্প্রদায়িক। তাই বলা যায়, সীমাবদ্ধ এই সব সাহিত্যে নাগরিকতা প্রশ্রয় পায়নি। স্পষ্টতঃ বলতে পারি, এই সব সাহিত্য স্রষ্টাদের ধর্মবোধ অ-নাগরিকতার জন্যে দায়ী নয়। তা যদি স্বীকার না করা যায় — তাহলে উপনিষদের ভাবধারায় ভাবিত রবীন্দ্রনাথের কাব্যেও নাগরিকতার অনুপ্রবেশ ঘটেনি। বিশেষতঃ যে কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি বিশ্বে সর্বোচ্চ খ্যাতির সম্মান লাভ করেছেন। তাঁর অনেক কবিতা হয়তো নগর-জীবনের দৈনন্দিন তালিকার দ্বারা সমস্যা-পীড়িত নয়। তথাপি রবীন্দ্রনাথ নাগরিক। এই নাগরিকতার

কারণ, তাঁর কাব্য নিঃসন্দেহে দেশোত্তীর্ণ। বিশ্ববোধে বিধৃত। অথচ সে কাব্যে নগরের কোলাহল নেই। কিন্তু সে কাব্য নগর থেকে নগরে দেয় পাড়ি। সুতরাং বলতে পারি, বাংলা সাহিত্য ধীরে ধীরে বিশ্ব-মানবিকতার সঙ্গে এক সূত্রে গ্রথিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথে তার যেমন স্ফুরণ, ভারতচন্দ্রে তেমনি তার সুরু। কেননা, ভারতচন্দ্রের সময়েই ইংরেজ জাতি এসেছে, এবং আমাদের চিন্তা সঙ্কীর্ণ সীমা অতিক্রম করেছে —যদিও মাঝখানে দেখেছি একটা সংশয় — কিন্তু তারপর সমস্ত জগৎকে জানার একটা আকুতি এবং তজ্জনিত বিস্ময়বোধ বাংলা কাব্য সাহিত্যকে গৌরবের শিখরে উন্নীত করেছে। এইখানেই, মূল জীবন সমস্যার সঙ্গে বিশ্বজনীনতা নাগরিক অভিধাকে সার্থকতর করেছে।

রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক কবিদের ভাবমুক্তি লক্ষিতব্য। ধর্মের ধার যেমন তাঁরা ধারেন না, তেমনি কোনোরকম গোঁড়ামির প্রশ্রয়ও তাঁদের কাছে অসহনীয়। অথচ দৈনন্দিন জীবনের মূল সমস্যা তাঁদের সাহিত্যে ঘনীভূত। ভারতচন্দ্রের সময় যখন একটি বণিক-শক্তি এসেই প্রভুত্ব স্থাপন করলো তখনই বাংলা সাহিত্যে নাগরিকতার বীজ রোপিত হোল। একদিনেই তা মহীরুহ হয়ে ওঠেনি। অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা, ঘাত-প্রতিঘাত তাঁদের সহ্য করতে হয়েছে। ঐ সহনশক্তির দ্বারাই নাগরিকতা একদিন বিশ্বনাগরিকতায় পরিণতি লাভ করবে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিক কবিদের জিজ্ঞাসা আশা এবং নাগরিকতার লক্ষণ রূপায়িত হয়ে উঠছে তাঁদের শ্রেষ্ঠ কাব্যে। জনৈক কবি বলেছেন,

> "মানুষ রক্তাক্ত ক্লান্ত হয়ে গেলে অনিমেষ দীপ
> মাঝে মাঝে পৃথিবীতে জেগে উঠে ম্লান
> অনন্দাকে আলো করে দিয়ে যেতে পারে,—
> এমন হয়তো রয়েছে অবদান।
>
> নগরী কি বেবিলন লণ্ডন কলকাতা? দিকচক্রবালে
> শূন্য? শূন্য? আমাদের মৃত পূর্বপুরুষেরা ঋণ
> শোধ করে দিতে ভুলে গিয়েছিল সব?
> চারিদিকে গাঢ় সূর্য্য করোজ্জ্বল দিন,
>
> অমৃত নক্ষত্রঃ তবু অদ্ভুত অন্নের ক্ষুধা নিয়ে
> মানুষ কি বিজড়িত হয়েছিল একদিন আজো তা তেমন
> রয়ে গেছে বলে লোক কেবলি মাছির মত মরে;
> যদিও নিখুঁত সব কন্‌ফারেন্‌স্‌ প্ল্যান কমিশন।"

দুর্গাদাস সরকার

বুদ্ধিজীবি ও রাষ্ট্রমনস্কতা

দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় বুদ্ধিজীবির রাষ্ট্রমনস্কতা উত্তর-স্বাধীনতা যুগে ক্রমবর্ধমান। অনেকেই আজ সরকারী উচ্চপদে যোগ দিয়েছেন বা সরকারী দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেন। আবার অন্যপক্ষে বুদ্ধিজীবিদের অপর এক বৃহৎ অংশ সক্রিয় রাজনীতিসূত্রে কোন না কোন বিরোধীদলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।

এই প্রবণতা ভাল কি মন্দ সে সম্বন্ধে চরম রায় দেবার আগে একথা অবশ্য স্মরণীয় যে বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর মধ্যে মূলগত ঐক্য সত্ত্বেও, শ্রেণী হিসেবে এরা এক-চরিত্র নয়। এদের মধ্যে পেশাগত, প্রবণতাগত, এত পার্থক্য রয়ে গেছে, যে বহুবিষয়েই এদের সম্বন্ধে কোন অনন্য নিয়ম পেশ করা চলে না। অতএব, রাষ্ট্রিক সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে এঁদের কর্তব্য আলোচনা প্রসঙ্গেও এদের বর্গীকরণ প্রয়োজন।

মোটামুটিভাবে বুদ্ধিজীবিদের দুভাগে ভাগ করা চলে। একদিকে বুদ্ধিজীবিদের এক বিরাট অংশ সমাজজীবনের কোন না কোন ক্রিয়াকাণ্ডে **বিশেষজ্ঞ** হিসেবে বিশেষ দায়িত্বের অধিকারী; অন্যপক্ষে রাখা চলে সাহিত্যিক, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ, অভিনেতা প্রভৃতি **সৃজনী-শিল্পকর্মীদের**। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের, অন্ততঃ একাংশ সম্বন্ধে সমস্যা জটিল নয়। এরা রাষ্ট্রতত্ত্বে, সমাজবিজ্ঞানের কোন রাষ্ট্রসম্পর্কিত প্রয়োগ-বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনার পক্ষে অত্যাবশ্যক। এরা যদি বিধানমণ্ডল, সংসদ, কিংবা সরকারী দপ্তরে নীতি প্রণেতা বা প্রয়োগকর্তা হিসেবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন, তবে তাতে আপত্তি অনাবশ্যক। কিন্তু সমস্যা জটিল প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্যান্য বিশেষজ্ঞ এবং সৃজনী-শিল্পীদের নিয়ে। পদার্থবিদ্যা, রসায়নতত্ত্ব ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে বা তৎসম্পর্কিত প্রয়োগবিদ্যার বিশেষজ্ঞ, অথবা, চিকিৎসক, মনঃস্তত্ত্ববিদ প্রভৃতি শ্রেণীর বুদ্ধিজীবিদের সাহায্য আইনপ্রণয়ন, রাষ্ট্রনীতি নির্দ্ধারণ বা সাধারণ প্রশাসনে অত্যাবশ্যক নয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে এদের মধ্যে অনেকেই কোন না কোন পক্ষভুক্ত হয়ে বিধানমণ্ডল তথা সক্রিয় রাজনীতিতে অথবা প্রশাসনিক অধ্যক্ষ হিসেবে নানা সচিবালয়ে যোগ দিচ্ছেন। রাষ্ট্রপরিচালনায় এদের অবদান কি বা কতখানি সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে। কিন্তু এ সত্য সন্দেহাতীত যে, ভারতবর্ষের মত পেছিয়ে পড়া দেশে উচ্চস্তরের বিশেষজ্ঞের দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান থাকতে, এঁরা নিজ নিজ কর্মক্ষেত্র সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিত্যাগ করে আসায় দেশ সবিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ডক্টর মেঘনাদ সাহা ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের থেকে বড় জননেতা বা রাষ্ট্রনায়ক এদেশে বহু আছেন; রাজনীতিক্ষেত্রে এদের স্থান হয়ত অন্য কেউ পূর্ণ করতে পারতেন; কিন্তু এ সত্য বিতর্কাতীত যে নিজ নিজ বিশিষ্ট ক্ষেত্রে এদের স্থান পূর্ণ করার মত প্রতিভা ভারতে সুলভ নয়। প্রতিভা সর্বত্রগামী হতে পারে বলেই যে তাকে স্বদেশচ্যুত হতে দিতে হবে, এ মত নিতান্তই অশ্রদ্ধেয়। বরং এ কথা অনেক বেশী যুক্তিসঙ্গত যে প্রায়ই স্বীয় কর্মক্ষেত্রে প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা অন্যত্র দ্বিতীয় শ্রেণীর বেশী নৈপুণ্য প্রদর্শন করতে পারে না। এই বিংশ শতাব্দীতে, যখন আমরা উৎপাদনের

উপকরণের সম্ব্যবহারের জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনার কথা বলে থাকি, তখন প্রতিভা বা বিশেষজ্ঞনৈপুণ্যের মত দুষ্প্রাপ্য জহরৎ-কে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে ব্যবহার না করা, আর যাই হোক, বিজ্ঞানসম্মত নয়।

অবশ্য বলা যেতে পারে যে বুদ্ধিজীবিদের কাউকেই বিধানমণ্ডলে বা প্রশাসনবিভাগে যোগ দিতে বাধ্য করা হয় নি। তাঁরা যদি সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বীয় কর্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে রাষ্ট্রকর্মে মনোযোগী হয়ে থাকেন, তবে তা স্বেচ্ছাতেই করেছেন। এবং এ প্রশ্নও ওঠা স্বাভাবিক যে তাদের স্বেচ্ছাভিত্তিক আকাঙ্খা বা প্রবণতাকে বাধা দেবার অধিকার সমাজের আছে কিনা?

এর উত্তর দুটি ঃ এক, আইননির্ভর; দুই, সমাজতাত্ত্বিক। আইনের পক্ষে মানুষের প্রবণতাকে বহুলাংশে সাপ্রয়ী বলে ধরে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই,— কারণ, আইনের কারবার এক-ধর্মিতা (ইউনিফরমিটি) নিয়ে। কার্যকরী হবার জন্যই সামান্যীকরণ আইনের পক্ষে অপরিহার্য। তাই মানবাধিকার বিষয়ক সমস্যার আইনগত উত্তর মূলতঃ ব্যক্তির আপাতদৃষ্ট প্রবণতার মর্যাদা স্বীকার ও প্রত্যক্ষ জবরদস্তির হাত থেকে তাকে রক্ষার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। সমাজ-অর্থনীতি—সংস্কৃতির যে খরস্রোতা অন্তঃপ্রবাহ প্রত্যক্ষ দৃষ্টির অগোচরে ব্যক্তির আচরণ ও আপাতদৃষ্ট "প্রবণতা"কে নিয়ন্ত্রণ করছে, তাকে প্রভাবিত করা আইনের কাজ নয়; সম্ভবও নয়।

কিন্তু আইনের চেয়েও জীবন বড়। সমাজজীবনের যে অশুভশক্তির প্রবলপ্রতাপের সামনে আইনপ্রণেতা অসহায়, মানবতত্ত্ববিদ্ সেখানেও বিশ্লাকরণীর সন্ধান দিতে পারেন। কারণ আধুনিক মানবতত্ত্ব পরম শ্রদ্ধা ও ধৈর্য্যের সঙ্গে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহার করে মানবজীবনের বহু বিচিত্র সমস্যাবলীর সর্বাঙ্গীন বিশ্লেষণ ও সমাধানে সচেষ্ট। মানবতত্ত্বের বিভিন্ন শাখাপ্রশাখা — বিশেষতঃ, সমাজতত্ত্ব, অর্থশাস্ত্র, ও সামাজিক মনঃস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-বিজ্ঞান ও ব্যবহারবিদ্যার লক্ষণীয় উন্নতি এই মহৎ প্রয়াসকে বিশেষ সাহায্য করেছে। তাই আইন বা রাষ্ট্রবিধি যেসব ব্যধি নিরাময়ে অক্ষম, তাও আজ আর দুশ্চিকিৎস্য নয়।

বুদ্ধিজীবির অত্যধিক রাষ্ট্রমনস্কতা নিবারণে আইন হয়ত বিশেষ সহায়ক হবে না। কারণ আইনদ্বারা নাগরিকের পেশা বা কর্মনির্বাচন নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাব মানবিক মর্যাদার দিক থেকে ভয়াবহ; অর্থতত্ত্বের বিচারেও অশুভ। কিন্তু আধুনিক সমাজতত্ত্ব হয়ত এ সমস্যারও কোন সমাধান দিতে পারে।

আধুনিক সমাজতত্ত্ব ব্যক্তি মানুষ বা গোষ্ঠির প্রবণতাকে সাপ্রয়ী বলে স্বীকার করেনা। সমাজতাত্ত্বিকের মতে ব্যক্তিমানুষ বা গোষ্ঠির অধিকাংশ সামাজিক আচরণ বা প্রবণতার পেছনেই কোন না কোন অদৃশ্য কিন্তু প্রবল শক্তিশালী সামাজিক প্রভাব কার্য্যকরী। এই প্রভাব বহু ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক, কিম্বা সাংস্কৃতিক অথবা মনঃস্তাত্ত্বিক, আবার বহুক্ষেত্রে রাষ্ট্রনৈতিক বা প্রতিষ্ঠানিক।

বুদ্ধিজীবির ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রমনস্কতার পেছনেও এরকম বিভিন্ন বাধ্যকারী শক্তি (compulsions) রয়েছে। প্রথমতঃ, বিংশশতকের সমাজজীবনে রাষ্ট্রক্ষমতার ক্রমবর্ধমান প্রসার প্রতিভাবানদের রাষ্ট্রমনস্ক হতে প্রলুব্ধ করে। প্রাক্-বিংশ শতকে সামাজিক ক্ষমতা একাধিক প্রতিষ্ঠানে বিকেন্দ্রীভূত ছিল। বিংশশতকে তা প্রায় সর্বত্রই রাষ্ট্রায়ত্ত বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত। অবশ্য প্রাক-বিংশশতকেও একচেটিয়া মূলধনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবে সামাজিক ক্ষমতার উৎস মুষ্টিমেয় ধনপতির হস্তগত হওয়ার বিশেষ বিপদ ছিল। রাষ্ট্রশক্তির বর্দ্ধিত ক্ষমতা বহুলাংশে সেই বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সমাজের প্রশতিশীল শক্তির সংগ্রামের ফলস্বরূপ। অনেকাংশে তা আবার শিল্পসমাজের অর্থনৈতিক স্থিতি ও বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতির অক্ষমতার অনিবার্য্য পরিণতি। কিন্তু এই

অশুভ প্রবণতাগুলির একমাত্র বিকল্প রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ নয় — সমাজকল্যাণের উদ্দেশ্যে সামাজিক ক্ষমতার সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য বিকেন্দ্রীভূত সামাজিক পদ্ধতির কথাও ভাবা চলে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই আদর্শের বাস্তব পরীক্ষার সুযোগ এখনও পাওয়া যায় নি বলে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রায় সমার্থবোধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অবস্থায় সমাজের নিয়ন্ত্রণশক্তির অংশভাগী হবার জন্য বুদ্ধিজীবি যে রাষ্ট্রশক্তির অংশীদার হতে চাইবে, তা অস্বাভাবিক নয়।

দ্বিতীয়তঃ এদেশে বুদ্ধিজীবির ক্রমবর্দ্ধমান রাষ্ট্রমনস্কতার পেছনে অর্থনৈতিক কারণও কম সক্রিয় নয়। ব্রিটীশ আমল, কিম্বা স্বাধীনতার পরে, কোনসময়েই এদেশে পারিশ্রমিক-কাঠামোকে (remuneration-structure) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয় নি। সামন্ততান্ত্রিক ঔপনিবেশিক পরিবেশের পঙ্গু ও রুগ্ন চাহিদা—যোগান ব্যবস্থার (demand supply mechanism) ফলস্বরূপ যে পারিশ্রমিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধোত্তর মুদ্রাস্ফীতির ফলে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনে ক্ষমতাসীন বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠির প্রভাবে সে কাঠামো আরও বিকৃত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের আগে এবং পরে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকৃত আয় তুলনা করলে দেখা যাবে যে পারিশ্রমিক কাঠামোর পরিবর্তনের ফলে রাষ্ট্র ও শিল্পপতিগোষ্ঠির প্রসাদবর্জ্জিত বুদ্ধিজীবি শ্রেণীই বর্তমানে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ বা মধ্যপর্যায়ের আমলা, বাণিজ্যপ্রতিষ্ঠানের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, শিল্পপ্রতিষ্ঠানের স্থপতি বা যন্ত্রবিদ, কিংবা সিনেমা শিল্প ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সৃজনী-শিল্পীদের (অভিনেতা গায়ক, লেখক) আয় যুদ্ধের মধ্যে ও পরে যথেষ্ট বেড়েছে; কিন্তু স্বাধীন সাহিত্যিক, সংবাদপত্রসেবী, শিক্ষক, অধ্যাপক বা বাণিজ্য-প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত বিজ্ঞানসেবী বা গবেষকের আয় প্রয়োজন অনুপাতে না বাড়ায়, তারাই আজ সবিশেষ বিপন্ন। যে সাহিত্যিক বই লিখে বা সাহিত্যপত্র সম্পাদনা করে ভালভাবে গ্রাসাচ্ছাদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে পারেন না, তিনিই সরকারী প্রচার বিভাগে যোগ দিলে পূর্বের তুলনায় চার বা পাঁচগুণ বেশী আয় করেন। বা অর্থতত্ত্ববিদ বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বাধীন গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের তুলনায় দ্বিগুণ বা ততোধিক বেতনে যখন সরকারী বা আধা সরকারী কর্মে অধিষ্ঠিত হবার সুযোগ পান, তখন আমাদের বর্তমান পারিশ্রমিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত ঝোঁক বুঝতে দেরী হয় না। এই অবস্থায় যদি সাহিত্যিক, শিল্পী, মানবতত্ত্ববিদ বা বৈজ্ঞানিক রাষ্ট্রের সুনজরে আসতে চেষ্টা করেন বা অধিক পরিমাণে রাষ্ট্রমনস্ক হন, তবে সেজন্য তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

কিন্তু এসব কারণ সত্ত্বেও বুদ্ধিজীবিদের ক্রমবর্দ্ধমান "স্বদেশচ্যুতি" এত ভয়াবহ হয়ে উঠত না, যদি সামাজিক মনঃস্তাত্ত্বিক পরিমণ্ডল তার স্বীয় কর্মক্ষেত্রের অনুকূল থাকত। এ যুগের মনঃস্তাত্ত্বিক মানবিক আচরণ ও প্রবণতা নির্দ্ধারণে ব্যক্তির প্রাধান্যমোহের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। বর্তমান সময়ে সামাজিক সম্মান তালিকায় ক্রমপর্য্যায় নির্দ্ধারণে যে দুটি বৈশিষ্ট্যকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়, তা' হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পদ ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা। বুদ্ধিজীবির পক্ষে "জাতবণিকের সঙ্গে সম্পদ অর্জ্জনের প্রতিযোগীতায় সাফল্য লাভ দুষ্কর। সুতরাং বৈশিষ্টলাভের অন্য বিকল্পটিকেই সে বেছে নিয়েছে। এ যুগের বুদ্ধিজীবি তাই হয় নিজে রাজনীতির খেলোয়াড়, নয়ত রাষ্ট্রে কর্মনির্দ্দেশক—নিদেনপক্ষে তাদের প্রমোদভিক্ষু।

এ পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে শোচনীয়। কিন্তু তার পূর্ণ দায়িত্ব একা বুদ্ধিজীবির নয়।

সুব্রতেশ ঘোষ

স মা লো চ না

কবি গান ও কবিওয়ালা

খ্যাতি ও সাফল্যের তুঙ্গ শীর্ষে সমাসীন কবি সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়াইয়া লিখিয়াছিলেন ঃ

সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গনের ধারে,
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।

• • •

কৃষাণের জীবনের শরিক যে জন,
কর্মে ও কথায় সত্য আত্মীয়তা করেছে অর্জন,
যে আছে মাটির কাছাকাছি,
যে কবির বাণী লাগি কান পেতে আছি।

• • •

এসো কবি অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের।
মর্মের বেদনা যত করিয়া উদ্ধার।

• • •

রবীন্দ্রনাথ স্বীয় কাব্যকৃতির যে ত্রুটির কথা লিখিয়াছেন তাহা শুধু বিনয় নহে যথার্থ সত্য। বাঙ্গলার দূরতম পল্লীর নিরক্ষর কৃষক শ্রমিক রবীন্দ্রসূর্যের মধ্যাহ্ন গগনে অবস্থিতিকালেও তাঁহার নাম শুনে নাই। মাইকেল—বঙ্কিম—শরৎচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্যরথীরাও বাঙ্গলার জনগণের অপরিচিত। গত দুইশত বৎসরে বাঙ্গলায় যে বিরাট সাহিত্য সৌধ গড়িয়া উঠিয়াছে — বাঙ্গলার আপামর জনসাধারণের তাহাতে প্রবেশাধিকার নাই, লিখন পঠনক্ষম মুষ্টিমেয় "ভদ্রলোক" শ্রেণীর মানুষেরই এই সাহিত্য সৌধে প্রবেশাধিকার আছে। আমাদের সাহিত্যের ভোজ সভায় ভোগ্য বস্তুর অপ্রাচুর্য নাই, অভাব ভোক্তার। নিরক্ষর দেশে শিক্ষা বিস্তারের কোন প্রচেষ্টা ইংরাজ শাসন কালে হয় নাই, বর্তমানেও উল্লেখযোগ্য উন্নত অবস্থার সৃষ্টি হয় নাই। রবীন্দ্রনাথ যে সমাজের সর্বস্তরে প্রবেশ করিতে পারেন নাই কৃষাণের শ্রমিকের জীবনের শরিক হইতে পারেন নাই— সে দুঃখ ও বেদনা শুধু তাঁহার নহে — রবীন্দ্র সাহিত্য তথা সমগ্র বাঙ্গলা সাহিত্য লইয়া যাহাদের সামান্যতম গর্ব বোধ আছে তাহাদের সকলেরই। এ যুগে সাহিত্য প্রচার শুধু মুদ্রাযন্ত্রের মধ্যেই সীমিত। অতীতে এ অবস্থা ছিল না, যদি থাকিত তবে রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী, কাশীরামদাস, কৃত্তিবাস ও বৈষ্ণব পদকর্তাদের আজ বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে হইত।

কবিগুরু অনাগত কালের যে কবিকে স্বাগত জানাইয়া বলিয়াছেন "এসো কবি অখ্যাত জনের, নির্বাক মনের" সে কবি কবে আসিবেন— আদৌ আসিবেন কিনা বলা কঠিন, তবে এক বা

একাধিক এমন কবি যে আসিয়াছিলেন — "উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাঙ্গলা সাহিত্য" * গ্রন্থে তাহার পরিচয় মিলিবে। ভারতচন্দ্রের পরবর্তী কালে ইংরেজ প্রভাব বিস্তারের প্রথম যুগে অন্তর্মুখী রসচেতনা বা জীবন-চেতনা লইয়া কবিগান সহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। গণদেবতার পূজার উপচার হিসাবে অন্তরের ভক্তিচন্দনে কবি গানের সৃষ্টি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত কবিগানের গৌরবোজ্জ্বল যুগ। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের পরবর্তী কালে কবিগানের ধারা ক্ষীণ হইয়া আসে। কবিগান লুপ্ত হইবার পূর্বে পরবর্তী বাঙ্গলা সাহিত্যকে গতিযুক্ত করিয়াছে ও প্রাণরসে প্রভাবিত করিয়াছে।

প্রায় শতাব্দী কালের মধ্যে বাঙ্গলা কবিগানের ক্ষেত্রে যাঁহারা যশস্বী হইয়াছিলেন তাঁহাদের নাম গোঁজলা গুঁই, রঘুনাথ দাস, রামজী দাস, কেষ্টামুচি, নিমে শুঁড়ি, লালু নন্দলাল, রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, বলহরি রায়, কৈলাস ঘটক, সৃষ্টিধর ঠাকুর, গৌর কবিরাজ, ভবানী বণিক, নবাই ঠাকুর, রাম বসু, নীলমণি পাটনী, নীলমণি ঠাকুর, রামপ্রসাদ ঠাকুর, ভোলা ময়রা, এন্টনি ফিরিঙ্গি, জনহ্যাল হেড, ঠাকুরদাস সিংহ, রামসুন্দর স্বর্ণকার, যজ্ঞেশ্বরী, গদাধর মুখোপাধ্যায়, রামানন্দ নন্দী, গোরক্ষনাথ যোগী, সাতু রায়, ঠাকুরদাস চক্রবর্তী, নবাই ময়রা, বলাই বৈষ্ণব, মহেশ কানা, মোহন সরকার, মধুসূদন সিংহ, হোসেন সেখ, সর্বানন্দ পারিয়াল, মোহিনী দাসী, ঈশান সামন্ত ও শশিমুখী, ক' বেল কামিনী প্রভৃতি। লক্ষ্য করিবার বিষয় এই সংক্ষিপ্ত তালিকায় মুচি, শুঁড়ি, ময়রা হইতে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত আছেন, মুসলমান এবং ফিরিঙ্গি কবিওয়ালারাও সর্বসাধারণের আসরে অবতীর্ণ, এমন সাংস্কৃতিক মিলনের চিত্র বর্তমানে তথাকথিত সমাজবাদী যুগেও বিরল।

বর্তমান পুস্তকে উপরোক্ত সকল কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী ও তাঁহাদের রচনার অর্থাৎ কবিগানের নিদর্শন সঙ্কলিত হইয়াছে। সঙ্কলিত কবিগানগুলি কাব্যাংশে তুচ্ছ নহে, উন্নাসিকতা পরিহার করিয়া পাঠ করিলে পাঠক ইহাতে প্রকৃত কাব্যরসের সন্ধান পাইবেন।

এই পুস্তকে প্রসঙ্গতঃ রামনিধি গুপ্ত, রূপচাঁদ পক্ষী, শ্রীধর কথক, কালী মির্জা, রাধামোহন সেন, মধুসূদন কিন্নর প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্ত ও রচনাদর্শ সঙ্কলিত হইয়াছে।

কবিগান ও কবিওয়ালাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহের জন্য কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের নিকট বাঙ্গালী জাতি সর্বতোভাবে ঋণী। সংবাদ প্রভাকর সম্পাদক গুপ্ত কবি, নবীন লেখকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও উৎসাহ দাতা ছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধু তাঁহারই আনুকূল্যে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন। নবীন যুগের হোতা স্বয়ং সার্থক কবি ঈশ্বর গুপ্ত বিগত যুগের কবি ও কবিওয়ালাদের জীবন বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন।

আলোচ্য পুস্তকের পরিশিষ্টে ঈশ্বর গুপ্তের জীবনী সঙ্কলনও সাতিশয় সমীচীন হইয়াছে। সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া গুপ্ত কবির প্রতি মাইকেল মধুসূদনের এই শ্রদ্ধার্ঘ স্মরণীয় :

এই ভাবি মনে,
নাহি কিহে কেহ তব বান্ধবের দলে,
তব চিতা ভস্মরাশি কুড়ায়ে যতনে,
স্নেহ শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে?
আছিলে রাখাল রাজ কাব্য ব্রজ ধামে

* উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাঙ্গলা সাহিত্য ।। নিরঞ্জন চক্রবর্তী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ; ১৩, মহাত্মাগান্ধী রোড, কলিকাতা-৭, মূল্য আট টাকা।

জীবে তুমি; নানা খেলা খেলিলা হরষে
যমুনা হয়েছে পার; তেঁই গোপ গ্রামে
সবে কি ভুলিল তোমা?

বাঙ্গলা সাহিত্যের অনাদৃত ও বিস্মৃত প্রায় রত্নগুলিকে উদ্ধার করিয়া লোক লোচনের সম্মুখে উপস্থিত করার জন্য লেখক পাঠক সমাজের ধন্যবাদার্হ। লেখক সুপরিচিত নহেন আশাকরা যায় বহু পরিশ্রমের ফল উনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাঙ্গলা সাহিত্য তাঁহাকে খ্যাতিমান করিবে ও তিনি অধিকতর নিষ্ঠার সহিত সোৎসাহে বঙ্গভারতীর সেবায় আত্মনিয়োগ করিবেন।

গৌরাঙ্গগোপাল সেনগুপ্ত

বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস

সুদীর্ঘকাল ধরে জনসমাজে বহুল প্রচলিত একটি প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার করে নতুন সত্যকে পরিচিত করবার সময় তার স্বপক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ তথ্যাদির প্রয়োজন। বাঙলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস রচিত হয়েছে। এক হাজার বছরের বাঙলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব অনেক পরে। যদিও অতি অল্পসময়ের মধ্যেই বিভিন্ন প্রতিভাবান স্রষ্টার সংস্পর্শে এসে গদ্য সাহিত্য আশাতিরিক্ত বলিষ্ঠরূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছে।

বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব সম্পর্কিত দ্বিবিধ মত প্রচলিত। বাঙলা ভাষায় রচিত নানা কাহিনীর মধ্যে—রূপকথা, মৈমনসিংহ গীতিকায় উপন্যাসের বীজ পাওয়া যায়। শুধুমাত্র গদ্যাকারে লিখিত হয় নি। অপরপক্ষের মতে বাঙলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাবের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব পাশ্চাত্য সাহিত্যের বিশেষভাবে ইংরেজী সাহিত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবেই বাঙলা উপন্যাসের সৃষ্টি।

উপন্যাস বলতে কি বুঝবো? একাধিক সংজ্ঞা দেওয়া চলে। সাধারণ ভাবে বলতে হয় একটি কাহিনী, যে কাহিনী বাস্তব, মানবজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। ঘটনা, ঘাত প্রতিঘাত চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি, পাত্র-পাত্রীর মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ, অন্তর্দ্বন্দ্ব, অসীম রহস্যময়তা—আধুনিক উপন্যাসের উপজীব্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করে দেখা গিয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' বাঙলাসাহিত্যের প্রথম সর্বাঙ্গসুন্দর সার্থকতম উপন্যাস। তার অনেক আগে লিখিত ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নববাবুবিলাসে' উপন্যাসের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে। অতঃপর 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়'। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা লাভ করেছে প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)।

শতবর্ষের উপর যে গৌরব লাভ করেছে 'আলালের ঘরের দুলাল' আজ নতুন সত্যের আবিষ্কারে সেই মর্যাদা আসনচ্যুত হচ্ছে। সম্প্রতি প্রকাশিত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ' * গ্রন্থটি সাহিত্য পাঠক ও ইতিহাস প্রণেতার মনে নতুন প্রশ্ন তুলবে, অনুসন্ধিৎসু রসিকমহলে সাড়া জাগাবে। এই গ্রন্থ আবিষ্কারের ও প্রকাশের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব

* হ্যানা ক্যাথেরীন মালেন্স বিরচিত—ফুলমণি ও করুণার বিবরণ ।।
চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত। জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যান্ড পারিসার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট : কলিকাতা-১৩, মূল্য পাঁচ টাকা।

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের। দীর্ঘকালের নিষ্ঠার অধ্যবসায়ে তিনি এই গ্রন্থটি সম্পাদনা করে সুবিস্তৃত ভূমিকা ও টীকা সহযোগে প্রকাশ করেছেন। বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায় যোজনা করলেন।

গ্রন্থটির পরিচিতিতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে এটিকে বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস রূপে স্বীকার করেছেন। সাহিত্য পাঠকের মনের দ্বিধা অনায়াসেই দূর হবে।

হানা ক্যাথেরীন ম্যালেন্স — জনৈকা ইংরেজ মহিলা বাঙলা ভাষায় এই উপন্যাস রচনা করেছেন। আলালের ঘরের দুলাল প্রকাশিত হবার ছয় বছর আগে ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। শ্রীমতী ম্যালেন্স কলকাতায় জন্মগ্রহণ ও দেহত্যাগ করেন। তিনি খৃষ্টান মিশনারী সমাজের মহিলা কর্মী ছিলেন। শিশুকাল থেকেই বাঙলা ভাষা শিক্ষা করেন —পরে অনুশীলনের সাহায্যে যোগ্যতা বৃদ্ধি করেন। এ দেশের অশিক্ষিত শ্রেণীর খৃষ্ট ধর্মান্তরিত হিন্দু বাঙ্গালী পরিবারকে নিয়ে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছিল— তাদের নিয়েই উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর ভাষা সহজ, সরল ও সুখপাঠ্য। বর্ণনায় তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতার ছাপ স্পষ্ট। একশ বছরেরও আগে লেখা এই উপন্যাসে ভারতের জনসাধারণের প্রতি যে সহানুভূতি ও উদারতা লেখিকা প্রকাশ করেছেন—তাতে বিস্মিত হতে হয়।

এক শতাব্দীর উপর এই উপন্যাসটি উপেক্ষিত হয়ে ছিল কেন সে প্রশ্নও মনে জাগবে। সম্পাদক মহাশয় বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করে সে প্রশ্নের মীমাংসা করেছেন। কেরি ও তাঁর পরবর্তী পাদ্রীরা যে সমস্ত বই লিখেছেন সেগুলি ছিল প্রয়োজন মেটাবার জন্যে। কিন্তু ১৮৫২ সালে একাধিক প্রতিভাবান বাঙলা গদ্য লেখক ও সাহিত্য স্রষ্টার আবির্ভাবের ফলে সে প্রয়োজন ফুরিয়েছে। সে যুগে নিছক মনোরঞ্জন ও সময় কাটাবার জন্যে কোন গ্রন্থ লিখিত হোত না। শ্রীমতী ম্যালেন্সের গ্রন্থও উদ্দেশ্য প্রণোদিত। দেশীয় খৃষ্টান নারীদের নীতিশিক্ষা দেবার জন্যেই এই গ্রন্থটি রচিত। কিন্তু এই কাহিনীর মধ্যে আধুনিক উপন্যাসের একাধিক লক্ষণ সুস্পষ্ট। চরিত্র সৃষ্টি, পরিবেশরচনা, ঘাতপ্রতিঘাত, মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ—আধুনিক উপন্যাসের একাধিক বৈশিষ্ট্য এই গ্রন্থে বর্তমান।

ফুলমণি ও করুণায় নারীচরিত্রই প্রাধান্য লাভ করেছে। ফুলমণি, করুণা, প্যারী, সুন্দরী ও রাণী — মূল চরিত্র। লেখিকা নিজেও একটি বিশিষ্ট চরিত্র। প্রত্যেককে নিয়েই কাহিনী গড়ে উঠেছে। চরিত্র ও ঘটনাসমাবেশ সর্বত্র দৃঢ়নিবন্ধ নয়। তবে কাহিনীর মধ্যে ভাবগত ঐক্য বিদ্যমান। এ উপন্যাসের লক্ষ্য সুস্থ স্বাভাবিক ধর্মাশ্রিত জীবন। একজন বিদেশিনী মহিলা বাঙ্গালী সমাজ সম্বন্ধে, নিচু তলার জীবনযাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে কী অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, ভাবলে বিস্মিত হই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক মূল গ্রন্থটি পাঠ করলেই এ কথার যাথার্থ্য অনুধাবন করবেন। লেখিকার তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশক্তি, বাঙলা ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা, চরিত্র চিত্রণের ক্ষমতা, কাহিনী বর্ণনভঙ্গি— সবকটি একত্র প্রযুক্ত হয়ে ফুলমণি ও করুণার বিবরণকে একটি সার্থক সৃষ্টিতে পরিণত করতে সমর্থ হয়েছে।

সর্বদিক বিবেচনা করেই পক্ষপাতহীন সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে ফুলমণি ও করুণার বিবরণকে প্রাপ্য মর্যাদা-দেওয়া বাঙালী সাহিত্য পাঠকের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করি। এখন থেকে ফুলমণি ও করুণা' বাঙলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসাবে স্বীকৃত হবে।

হরেন ঘোষ

রবীন্দ্র রচনাবলী

¶ পুরো সেট যাতে একসঙ্গে পাওয়া যায় তার আয়োজন সম্পূর্ণপ্রায়।
¶ এখন ২৬ খণ্ডের মধ্যে ২৪ খণ্ড পাওয়া যাচ্ছে।

॥ ক্রেতৃবর্গের প্রতি নিবেদন ॥

¶ বিশ্বভারতী কার্যালয়ে (৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা ৭) চিঠি লিখে স্থায়ী গ্রাহক হওয়া যায়।

¶ গ্রাহক হওয়ার জন্যে স্বতন্ত্র কোনো দক্ষিণা দিতে হয় না, চিঠি লিখে দিলেই চলে।

¶ আপনি যদি ইতিপূর্বে কোনো খণ্ড কিনে থাকেন তা হলে চিঠিতে সে কথা জানাবেন।

¶ খণ্ডগুলি ক. কাগজের মলাট, অথবা খ. সাধারণ কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই, বা গ. মোটা কাগজে ছাপা ও রেক্সিনে বাঁধাই, সে কথাও জানাবেন।

¶ ভবিষ্যতে নূতন খণ্ড প্রকাশিত হলে, বা পূর্ববর্তী যে খণ্ড এখন ছাপা নাই সেগুলি পুনর্মুদ্রিত হলে, গ্রাহকদের চিঠি লিখে জানানো হয়।

॥ রবীন্দ্র-রচনাবলীর বিভিন্ন সংস্করণ ॥

ক. কাগজের মলাট সংস্করণ, প্রতি খণ্ড ৮৲, নবম ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড ৯৲
খ. সাধারণ কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই প্রতি খণ্ড ১১৲ নবম ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড ১২৲
গ. মোটা কাগজে ছাপা, রেক্সিনে বাঁধাই, প্রতি খণ্ড ১২৲, নবম ও ত্রয়োবিংশ খণ্ড ১৩৲

গ.-সংস্করণ বর্তমানে নিম্নলিখিত খণ্ডগুলি পাওয়া যায়—

১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৯
১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২

কাগজের মূল্যবৃদ্ধি হেতু নবপ্রকাশিত নবম ও ত্রয়োবিংশ খণ্ডের মূল্য স্বতন্ত্র হারে নির্ধারিত হল। পূর্বমুদ্রিত খণ্ডগুলির মূল্য অপরিবর্তিত।

বিশ্বভারতী